Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## নামাজের গুরুত্ব ,ফজিলত ও নামায তরক করার বিধান কি?


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

দিলরুবা আমিন

রোলঃ 216021874


৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

## নামাজের গুরুত্ব ,ফজিলত ও নামায তরক করার বিধান কি?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

দিলরুবা আমিন

রোলঃ 216021874

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ,ফজিলত ও নামায তরক করার বিধান কি?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে দিলরুবা আমিন, আইডিঃ 216021874 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “নামাজের গুরুত্ব ,ফজিলত ও নামায তরক করার বিধান কি?” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Dilruba

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

**দিলরুবা আমিন**

আইডিঃ 216021874

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

✿ بســــــم الله الرحـمن الرحيـــــــم✿

اِنَّنِىٓ اَنَا اللهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىۛ

নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।

—ত্বা-হা - **১৪**

# *কিছু কথা*

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَزْوَجِهٖ وَاصْحَابِهٖ اَجْمَعِين.

আলহামদুলিল্লাহ,
ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।
মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আল্লাহ তাআলা আমার মত এ নগণ্য বন্দীকে "নামাজের গুরুত্ব, ফজিলত ও তরক করার বিধান"এই টপিকটার উপরে সামান্য মেহনত করার তৌফিক দিয়েছেন।

সেই সাথে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর দরুদ ও সালাম পেশ করছি।।

বান্দার জন্য ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজ। বিচার দিবসে সর্বপ্রথম বান্দা থেকে নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যার নামাজ ঠিক তার অন্যান্য সবকিছুই ঠিক হবে। আর যার নামাজ ত্রুটিপূর্ণ হবে তার অন্যান্য সবকিছুই আরো অধিক ত্রুটিপূর্ণ হবে।

কুরআন - হাদিস তথা ইসলামী শরীআতে ঈমানের পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নামাজের ব্যাপারে। কারণ বান্দা তার প্রভুর দরবারে ভালোবাসা প্রকাশের জন্য আত্মোউৎসর্গিত হয়ে স্বীয় মুখাপেক্ষিতা ও দীনতা- হীনতা প্রকাশ করে তাঁর নৈকট্য ,দয়া ও সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াস পায় এবং তাঁর যিকির দ্বারা নিজ অন্তরকে আলোকিত করার সাধনা করে। আরে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নামাযই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা।
এজন্য সকল নবীর শিক্ষায় এবং প্রতিটি আসমানী শরীআতে ঈমানের পর সর্বপ্রথম নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই একই কারণে আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শরীআত- শরীআতে মোহাম্মদীর উপর নামাজের ফরয,(শর্ত ও রুকন) ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, আদাব এবং তদ্রূপ ভাবে নামাজ ভঙ্গকারী ও নামাজের মাকরুহ বিষয় সমূহের আলোচনা এমন

গুরুত্বসহকারে ও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে অন্য কোন এবাদতের ক্ষেত্রে এমনটি করা হয়নি।

ফরজ, ওয়াজিব ,সুন্নত ,মুস্তাহাব ও আদাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইখলাস ও একাগ্রতা সহিত  সুন্নত মোতাবেক নামাজ আদায় করে বান্দা যেমন সফলতার শীর্ষে পৌঁছে যেতে পারে, পক্ষান্তরে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য না রেখে উদাসীনতা ও অমনোযোগীতার সাথে নামাজ আদায় করলে এবং নামাজ তরক করলে সেটা তার জন্য অভিশাপের কারণও হতে পারে।

তাই কোরআন হাদিস এর মাধ্যমে যুগে যুগে আল্লাহ পাকের বিশেষ নিকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ এ ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার জন্য তাকিদ করেছেন।

## {{{ সালাতের প্রাথমিক আলোচনা}}}

### সালাত কি?

সালাত আরবি শব্দ ।
এর আভিধানিক অর্থ হল : দোয়া করা, ক্ষমাপ্রার্থনা করা, দরুদ পাঠ করা, রহমত ইত্যাদি।

সালাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল: কিছু পাঠ ও কিছু কাজের সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত যা রুকু, সেজদা অর্থাৎ নির্ধারিত শর্তাবলীর সাথে আদায় করা হয় যা তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে শুরু এবং সালাম এর মাধ্যমে শেষ করা হয়,তাকেই সালাত বলা হয়।

সালাত হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত, তা আল্লাহর সাথে বান্দার সংযোগ স্থাপন করে।
সালাত ইসলামের ৫টি রোকনের মধ্যে দ্বিতীয় রোকন। ঈমান আনার পরেই সালাতের স্থান। সালাত প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ বা অবশ্যকরনীয়।

### সালাত ফরজ হওয়ার ইতিহাস:

হিজরতের পূর্বে মি’রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। এর পূর্বে দু’ ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল । সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাত। আর সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাত।

নবীজি (সা.)-এর ২৩ বছরের নবুওয়তি জীবনের অন্যতম অলৌকিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো মেরাজ। মহিমান্বিত এ রাতে মহানবী (সা.) সাত আসমান, আরশে আজিম, জান্নাত-জাহান্নাম পরিভ্রমণ করেন, আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং উম্মতের জন্য নিয়ে আসেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আদেশসহ ইসলামী সমাজ পরিচালনার বিধি-বিধান।
পবিত্র কোরআনের সুরা বাণী ইসরাইলে আল্লাহ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

শবে মেরাজে ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহর দিদারের সৌভাগ্য শেষে উম্মতর জন্য উপহার স্বরূপ নামাজ নিয়ে ফিরে আসেন নবীজি (সা.)। তখন  দিনরাতে উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। নবীজি আল্লাহর পক্ষ থেকে ৫০ ওয়াক্ত সালাতের এ হাদিয়া নিয়ে ফেরত আসছিলেন; এর মধ্যে দেখা হযরত মূসা আ.-এর সাথে। হযরত মূসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য কী দিয়েছেন? নবীজি বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। হযরত মূসা বললেন, আপনার উম্মত রাত-দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না। আপনার  আগে আমি উম্মত চালিয়ে এসেছি। আপনি আল্লাহর কাছে গিয়ে কমিয়ে আনেন।

নবীজি সে মতে আল্লাহর কাছে গিয়ে কম করে দেওয়ার দরখাস্ত করলেন। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। নবীজি তা নিয়ে ফেরত আসছিলেন। আবার হযরত মূসা আ.-এর সাথে দেখা হলো। বললেন, আপনার উম্মত তা পারবে না। আপনি আরো কমিয়ে আনুন। নবীজি আবার আল্লাহর কাছে গিয়ে আগের মতো দরখাস্ত  করে আরো পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে আনলেন। নবীজি (সা.) বলেন, এভাবে আমি আল্লাহ ও মূসার মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকি। শেষবার আল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ! এই হলো দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।  প্রত্যেক নামাজের বিনিময়ে দশ নামাজের সাওয়াব। এভাবে বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব পাবে। কেউ কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা করবে কিন্তু করতে পারবে না, তার জন্যও নেকি রয়েছে; এক নেকি। আর যদি ভালো কাজটি করে তাহলে তার জন্য দশ নেকী। আর কেউ কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করলে কোনো গুনাহ লেখা হবে না। তবে তা করে বসলে একটি গুনাহ লেখা হবে।

নবীজি এ সওগাত নিয়ে ফেরত আসছিলেন। হযরত মূসার সাথে দেখা হলো। মূসা আ. এবার শুনে বললেন, আপনি যান, আরো কমিয়ে আনুন। আপনার উম্মত পারবে না। বনী ইসরাঈলের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। নবীজি বললেন, আমার আর কিছু বলতে লজ্জা হচ্ছে!

(বুখারি, হাদিস: ৩৮৮৭; মুসলিম, হাদিস: ১৬২, ১৬৪)।

## সালাতের প্রকারভেদ:

সালাত দুই প্রকার:

১/রুকু সিজদা বিশিষ্ট সালাত।
২/রুকু সিজদা বিহীন সালাত।

রুকু সেজদা বিহীন নামাজ হল জানাজার নামাজ।

আর রুকু সেজদা বিশিষ্ট নামাজগুলির মধ্যে আছে:-ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল।

**ফরজ সালাত :**

শরিয়াহ কর্তৃক বান্দাদের নিকট যা আবশ্যকীয়তা এবং দৃঢ়তার সাথে চাওয়া হয়; যে বিধানটি ক্বতয়ী তথা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

অর্থাৎ যা আল্লাহর নির্দেশিত  অবশ্যই পালনীয় আমল।
এ নামাজ ফরযে আইনের আওতায় পড়ে এবং তা প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে ফরজ।

এ নামাজগুলোর মধ্যে হল; দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যেমন:-ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিবরণ কুরআন মাজিদ এবং হদীসে এ উল্লেখ আছে।

***আল্লাহতালা বলেন,,

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝

সুতরাং আল্লাহর তাসবীহতে লিপ্ত থাক যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা ভোরের সম্মুখীন হও।

—আর রুম - ১৭

وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

এবং তারই প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এবং বিকাল বেলায় (তার তাসবীহতে লিপ্ত হও) এবং জুহরের সময়ও।

—আর রুম - ১৮

***তেমনি ভাবে হাদীসে এসেছে,,
তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, নাজদের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর খেদমতে আসলো ।তার মাথার চুল গুলো ছিল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত
। আমরা তার গুনগুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কি বলছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না। অতঃপর সে রসূল সাঃ এর নিকট এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

خمس صلوات في اليوم والليله-فقال هل علي غيرهن قال-لا الا ان تطوع وصيام شهر رمضان-فقال هل علي غيره فقال-لا الا ان تطوع.

অর্থ: রাসূল (সা.) বলেন, দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। সে বলল এছাড়া আমার আর কোন কিছু (সালাত) আছে কি? না, তবে নফল (স্বেচ্ছায়) আদায় করতে পারো।

-সহিহ মুসলিম-৮

হুকুম:

করলে সাওয়াব, না করলে গুনাহগার হতে হয়। আর ফরজ অস্বীকারকারী কাফির।

**ওয়াজিব সালাত:**

ওয়াজিব হল; যা করার আদেশটি জন্নী (অকাট্য নয়) তথা ফরজের তুলনা দুর্বল খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত।
অর্থাৎ এই নামাজের গুরুত্ব ফরজের পরেই।

নামাজগুলো হল: ঈদের সালাত, বিতর সালাত।

হুকুম:

করলে সওয়াব, না করলে গুনাহগার হতে হয়। আর ওয়াজিব অস্বীকারকারী গোমরাহ এবং ফাসিক হয় ।কাফির হয় না। হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্যান্য সকল মাযহাবে ফরজ এবং ওয়াজিব দুটি একই।

**সুন্নাত সালাত:**

সুন্নত নামাজ দুই প্রকার:

১/সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।
২/সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ:

যে আমল রাসূল (সা.) ইবাদত হিসেবে পাবন্দীর সাথে করেছেন, কখনো ওজরবশত ছেড়ে দিয়েছেন, এরকম আমলকে সুন্নতে মুয়াক্কাদা বলা হয়।

যেমন: ফজরের দুই রাকাত সুন্নত, জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের ফরজের পরে দুই রাকাত, এশার ফরজের পরে দুই রাকাত, তারাবি নামাজ, পুরুষের জন্য মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ইত্যাদি

হুকুম:

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ প্রায় ওয়াজিবের কাছাকাছি অর্থাৎ ওয়াজিবের ব্যাপারে যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি সুন্নাতে মুয়াক্কাদার ক্ষেত্রেও জবাবদিহি করতে হবে। তবে ওয়াজিব তরককারীর জন্য সুনিশ্চিত শাস্তি পেতে হবে আর সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ছেড়ে দিলে কখনো মাপ পেয়ে যেতে পারে তবে শাস্তিও পেতে পারে।

সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ:

যার রাসূল (সা.) সর্বদা করতেন, মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন।
যেমন: কোন ওজন ছাড়াই এশার- আসর সালাতের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত ইত্যাদি।

হুকুম:
এই ধরনের আমল কারীর সাওয়াব পাবেন; তবে বর্জনকারীর শাস্তি পাবেন না।

**নফল সালাত:**

নফল নামাজ দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার নৈকট্য লাভ হয়।

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসের একাংশ বর্ণিত হয়েছে-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন,

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه. ُ

অর্থাৎ, নফল দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি।

-সহিহ বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী- ৬০৫২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬০৫৮)

নফল সালাতগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সালাত হলো:-
তাহাজ্জুদ,এশরাক,চাশত,যাওয়াল,
আওয়াবীন।

এছাড়াও সালাতুত তাসবিহ, ইস্তেখারা, তওবার নামাজ, সালাতুল হাজত, শোকরের নামাজ ইত্যাদি ।

*হুকুম:

পড়লে সাওয়াব আছে । না পড়লে গুনাহ নাই।

**সালাতের সময়**

ফজর সালাতের সময়:-

***ওয়াক্তের শুরু: সুবহে সাদিকের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময়।

***ওয়াক্তের শেষ: সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

যোহরের সালাতের সময়:-

***ওয়াক্তের শুরু: ঠিক দ্বীপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর জোহরের সালাতের সময় শুরু হয়। প্রত্যেক জিনিসের ছায়ায় আসলি তথা মূল ছায়া ব্যতীত (অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে আসে সে সময় মানুষের যে ছায়া হয় তাকে ছায়ায় আসলি বলা হয় ।এ সময় নির্ধারণ করার একটি সহজ পদ্ধতি হলো মাটিতে কোন লাঠি পুঁতে রেখে তার ছায়ার দিকে লক্ষ্য করা যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিগুণ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত জোহরের সময় থাকবে)

***ওয়াক্তের শেষ:
জোহরের ওয়াক্তের সমাপ্তি ও আসরের শুরুর সময় নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে মালিকি, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মূলধরার মত হল মধ্যাহ্নের কোন বস্তুর যে ছায়া থাকে সেটিকে বাদ দিয়ে বস্তুটির ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয় তখন যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয় এবং আসরের সালাতের সময় শুরু হয়।
ইমাম আবু হানিফা ( রা.) প্রধানত দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ আশ শায়বানিও সহ কিছু হানাফী ফিকহ এই একই মত পোষণ করেন।

অন্যদিকে আবু হানিফা (র.) মতে মধ্যাহ্নে কোন বস্তুর যে ছায়া থাকে সেটিকে বাদ দিয়ে বস্তুটির ছায়া তার দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে এবং এরপর আসরের সালাতের সময় শুরু হয় এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের মূল ধারার মত এটি।
হযরত আবু হুরায়রা রাঃ বলেন,
"আমি তোমাদের জানাচ্ছি যে, যখন তোমার ছায়া তোমার সমান হয়, তখন যোহরের সালাত পড়ো, আর যখন তা দ্বিগুণ হয়, তখন আসরের সালাত পড়ো"।
-মুয়াত্তা মালিক-১২৯ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-২০৪১

আসরের সময়:

***ওয়াক্তের শুরু:
জোহরের সালাতের সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসরের সালাত সময় শুরু হয়ে যায় ।অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের মূল ছায়া বাদ দিয়ে যখন দ্বিগুণ হয়, তখনই আসরের সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়।

***ওয়াক্তের শেষ: অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সালাতের সময় থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসরের সালাত আদায় করা মাকরুহে তাহরিমি।

মাগরিবের সময়:

***ওয়াক্তের শুরু: সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু।

***ওয়াক্তের শেষ: পশ্চিম আকাশে লাল রং (লালিমা)দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত সময় বাকি থাকে।

এশার সময়:

***ওয়াক্তের শুরু: মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হওয়ার পরেই এশার সালাতের সময় শুরু হয়।

***ওয়াক্তের শেষ: সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এশার সালাতের সময় বাকি থাকে। তবে রাতের এক তৃতীয়াংশ দেরি করে এশার সালাত আদায় করা মুস্তাহাব ।আর বিনা ওজরে অর্ধ রাতের পর এশার সালাত আদায় করা মাকরুহ।
--ফতোয়ায়ে দারুল উলুম ০২/৫২
আহসানুল ফতোয়া৯২)১৩০
আল বাহরুর রায়েক০১/২৪৬

বিতরের সময়:

এশার পর পর হতে যতক্ষণ না পর্যন্ত ফজর উদিত হয়।

তাহাজ্জুতের সময়:

এশার সালাতের পর হতে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত।

***এছাড়া জুম্মার নামাজের ওয়াক্ত শুক্রবার জোহরের সময়ে।

## সালাতের নিষিদ্ধ সময়:

সালাতের নিষিদ্ধ সময় তিনটি  এই তিন সময় সালাত আদায় করা হারাম।

১/সূর্যোদয়ের সময়।
২/সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে।
৩/সূর্য যখন অস্ত যায়।

## সালাতের রাকাতসমূহ

১//ফজর -  সুন্নাত- ২, ফরজ -২
২//যোহর- সুন্নাত-৪,ফরজ -৪,
সুন্নাত -২,নফল-২
৩//আসর-সুন্নাত-৪, ফরজ-৪
৪//মাগরিব -ফরজ-৩, সুন্নাত -২, নফল -২
৫//এশা- সুন্নাত -৪, ফরজ -৪, সুন্নাত ২,বিতির-৩,নফল-২
৬//জুম্মাহ-সুন্নাত ৪,ফরজ -২, সুন্নাত ২/৪, নফল -২

## সালাতে ফরজ সমূহ:

সালাতে ফরজ তেরটি । সালাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সাতটি আর আরম্ভ হওয়ার পরে ছয়টি। এগুলোকে সালাতের আহকাম বা শর্ত বলা হয়। এ শর্তগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে নামাজ হবে না।

সালাত শুরু করার পূর্বের শর্ত :

১/জায়গা পাক।
২/কাপড় পাক।
৩/শরীর পাক।
৪/সতর ঢাকা।
৫/কিবলামুখী হওয়া।
৬/ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া।
৭/নামাজের নিয়ত করা।

সালাত শুরু করার পরের শর্ত :

১/দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরিমা বলা।
২/কিয়াম করা বা দাঁড়ানো।
৩/কিরাত পড়া।
৪/ রুকু করা ।
৫/সিজদা করা ।
৬/কা'দায়ে আখিরা (শেষ বৈঠক)।

## সালাতের ওয়াজিব সমূহ:

তাড়াতাড়ি মধ্যে কিছু বিষয় আছে অবশ্যই করণীয় ।তবে তা ফরজ নয়, আবার সুন্নত ও নয়। ফরজ (রুকন) এরপরেই ওয়াজিবের স্থান, যা আবশ্যক। যা ইচ্ছা কৃতভাবে তরক(বাদ) করলে সালাত বাতিল হয়ে যায়। এবং ভুলক্রমে ত্যাগ করলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়।

ওয়াজিবগুলি হল:
১) তাকবীরে তাহরিমা "আল্লাহু আকবার" বলা।
২) সূরা ফাতিহা পাঠ করা।
৩) সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানা।

৪) সূরা ফাতিহা কে অন্য সূরার আগে পড়া।

৫) ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতকে কিরাতের জন্য নির্ধারিত করা।

৬) উচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে কেরাত পাঠ করা।

৭) দোয়া কুনুত পাঠ করা।

৮) রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৯) দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

১০)প্রথম বৈঠক।

১১)আত্তাহিয়াতু পাঠ করা।

১২) আসসালামু আলাইকুম বলে সালাত শেষ করা।

১৩) প্রত্যেক রাকাতের তারতিব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

১৪) তাদিলে আরকান বা ধীরস্থির ভাবে সালাত আদায় করা।

## সালাতের সুন্নত সমূহ

আমরা এখানে ফিকহে হানাফি অনুযায়ী নামাজের সুন্নাতগুলা বর্ণনা করতেছি।

১) পুরুষদের জন্য তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত। আর মহিলাদের কাধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নত।

২) পুরুষেরা নাভির নিচে হাত রাখা। আর মহিলারা বুকের উপরে।

৩)ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখা।

৪) ছানাপড়া।

৫) আউজুবিল্লাহ পড়া।

৬) আস্তে আস্তে বিসমিল্লাহ পড়া।

৭) অনুচ্ছেস্বরে আমিন বলা ।

৮) প্রথম রাকাতের কেরাতকে দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে দীর্ঘ করা।

৯) রুকুতে পুরুষের জন্য উভয় হাতের আঙ্গুল ফাঁকা রাখা এবং মহিলার জন্য মিলিয়ে রাখা।

১০) পুরুষ এর জন্য পিঠ থেকে কোমর অবধি সোজা রাখা।

আবূ মাসুদ আলম বাদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“যে ব্যাক্তি রুকু ও সিজদাতে পিঠ সোজা করে না, তাঁর সালাত যথেষ্ট নয় “
-আবু দাউদ- ৮৫৫

১১) রুকুতে কমপক্ষে তিন বার রুকুর তাসবিহ পড়া।

১২) রুকু থেকে উঠার সময় ”সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা” ও রব্বানা রাখাল হামদ বলা।

১৩) সিজদার সময় নামাযির দুই হাত জমিনে রাখার পূর্বে, প্রথমে তার দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর চেহারা এবং সেজদা থেকে উত্তোলনের সময় প্রথমে চেহারা, দুই হাত তারপর দুই হাত উত্তোলন করা সুন্নত।

১৪) সালাতের সিদ্ধারত অবস্থায় পুরুষের পেট দুই উরু থেকে দুই কনুই দুই পাশ থেকে এবং দুই বাহু ভূমি থেকে পৃথক রাখা।

আর মহিলাদের জন্য সব অঙ্গগুলো মিলিয়ে রাখা। সেজদারত অবস্থায় হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো মিলিত এবং কিবলামুখী রাখা।

১৫) দুই হাতের মাঝখানে (চেহারা রেখে) সেজদা করা।

১৬) সেজদা কমপক্ষে তিন বার নিম্নস্বরে “সুবহানাল্লাহ রাব্বিয়াল আলা” বলা।

১৭) পুরুষের জন্য নামাজে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে করে রাখা।

১৮) দুই সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় নিন্মুক্ত দোয়া পড়া।

ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু সালাম দুই সিজদার মাঝখানে এই দোয়া পড়তেন।

اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني .

১৯) তাশাহুদে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার সময় শাহাদাত আঁঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা করা।

২০) শেষ বৈঠকে তাশাহুদ এর পর দুরুদ শরীফ পড়া।

২১) সালাত শেষ করার জন্য সালাম এর সাথে ডানে বামে চেহারা ফেরানো।

এছাড়াও কিছু সুন্নত আছে যেমন:

২২) সালাতে যথাসম্ভব কাশি ও হাই চেপে রাখা।

২৩)এক রোকন থেকে অন্য রকমে যাবার সময় আল্লাহু আকবার বলা।

## সালাতের মাকরুহ সমূহ

১)সালাতরত অবস্থায় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরূহ যদি তা আমলে কাছে না হয়।

২) সিজার স্থান থেকে কংকর বা পাথরকণা সরানো মাকরূহ। অবশ্য সেজদা করা অসম্ভব হলে এক দুইবার কংকর সারানোর অবকাশ আছে।

৩) আঙ্গুল সমূহকে মলা বা টেনে ফোটানো।

৪) বস্ত্র, শরীর অথবা দাড়ির সাথে খেলা করা।

৫) কোমরে হাত রাখা মাকরুহ।

৬) ওজর ছাড়াই উভয় হাঁটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব পায়ের উপর কুকুরের ন্যায় বসা।

৭) সেজদার উভয় বাহুকে ( পুরুষের জন্য) মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া।

৮) হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া।

৯) ফরজ সালাতে বিনা ওজরে আসন করে বসা।

১০) মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফাজত করা।

১১) কাপড় কাঁধে রেখে উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে দেওয়া।

১২) ইচ্ছাকৃত হাই তোলা। তবে প্রতিহত করতে না পারলে সমস্যা নেই।

১৩) শরীরের অলসতা দূর করার জন্য মোঁচড়ানো।

১৪) চোখ বন্ধ রাখা অথচ দৃষ্টির সেজদার স্থানে না রাখা।

১৫) চুল মাথার উপর ভাঁজ করে গিরা দিয়ে সালাত পড়া।

১৬) খোলা মাথার সালাত পড়া মাকরুহ। তবে বিনয়ন ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না।

১৭) আয়াত ও তসবিসহ সমূহ হাতে গণনা করা। তবে সাহেবাইন:(র) এর মতে এটি মাত্র নয়।

১৮) শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোক মেহরাবের বাহিরে দাঁড়ানো।

১৯) ইমাম সাহেব একা উচুস্থান এবং সমস্ত লোক নিচু দাঁড়ানো।

২০)০ কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিছনে একা দাঁড়ানো।

২১) মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।

২২) সামনে, বামে অথবা ডানে ছবি থাকা অবস্থায় সালাত মাকরূহ তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পেছনে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

২৩)সালাতের কোন সুন্নত পরিত্যাগ করা।

## সালাত ভঙ্গের কারণ

সালাতের ভেতর এমন কোন শব্দ করা যা সাধারণত কথার অন্তর্ভুক্ত হোক সেটা এক অক্ষর বা দুই অক্ষরে গঠিত, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, অর্থবোধক হোক বা অর্থহীন হোক সালাত ভেঙ্গে যাবে। আবার কিছু কাজ সংক্রান্ত কারণ আছে সেগুলো করলেও সালাদ ভেঙ্গে যাবে।

কথা এবং কাজ সংক্রান্ত কারন গুলো নিম্নক্ত আলোচনা করা হলো:

১) সালাতে অশুদ্ধ পড়া।

২) সালাতের ভিতর কথা বলা।

৩) দুনিয়াবি কথা বলা।

৪) কোন লোককে সালাম দেওয়া।

৫) সালামের উত্তর দেওয়া।

৬) উহ-আহ শব্দ করা।

৭) বিনা ও জোরে কাঁশি দেওয়া।

৮) বিপদে কিংবা বেদনায় শব্দ করিয়া কাঁদা।

৯) সালাতে খাওয়া ও পান করা।

১০) মুক্তাদী ছাড়া অন্য ব্যক্তির লোকমা নেওয়া।

১১) সালাতে কোরআন শরীফ দেখে পড়া।

১২) তিন তাসবিহ পরিমাণ সতর্ক খুলে থাকা।

১৩) আমলের কাসির করা।

১৪) কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া।

১৫) ইমামের আগে মুক্তাদি দাঁড়ানো।

প্রসিদ্ধ কারণ গুলো ছাড়াও সালাত ভঙ্গ হওয়ার আরো অনেকগুলি কারণ আছে যেমন কোন প্রাপ্তবয়স্ক নারী পাশে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া,ইমামের আগে কোন রোকন আদায় করে ফেলা, ইচ্ছাকৃত ওযু ভাঙ্গার মত কোন কাজ করে ফেলা, পাগল, মাতাল কিংবা অচেতন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সালাত ভঙ্গের এর কারন।

এ ছিল নামাজের ওয়াক্ত,রাকাত,ফরজ,
ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল। নামাজ ভঙ্গের  নামাজ এর সময়। নামাজের আহকাম ইত্যাদি নিয়ে মোটামুটি আলোচনা। এবার আসি মূল কথায়।

## {{{সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত}}}

## কুরআনে সালাতের গুরুত্ব:

সালাত মানব জীবনে এতটা গুরুত্ব বহন করে যে, সালাত ছাড়া মুমিন জীবন কল্পনা করা যায় না।

কোন বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ সরল পদ্ধতি হলো সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাজের উপর গুরুত্বআরোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাজের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

পবিত্র কালামে আল্লাহতালা বলেন,

وَاَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَارۡکَعُوۡا مَعَ الرّٰکِعِیۡنَ ۝

এবং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর ও রুকূ‘কারীদের সাথে রুকূ‘ কর।

—আল বাকারা - ৪৩

অন্যত্র আল্লাহ পাক আরো বলেছেন,

وَجَاہِدُوۡا فِی اللّٰہِ حَقَّ جِہَادِہٖ ؕ ہُوَ اجۡتَبٰىکُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَیۡکُمۡ فِی الدِّیۡنِ مِنۡ حَرَجٍ ؕ مِلَّۃَ اَبِیۡکُمۡ اِبۡرٰہِیۡمَ ؕ ہُوَ سَمّٰىکُمُ الۡمُسۡلِمِیۡنَ ۬ۙ مِنۡ قَبۡلُ وَفِیۡ ہٰذَا لِیَکُوۡنَ الرَّسُوۡلُ شَہِیۡدًا عَلَیۡکُمۡ وَتَکُوۡنُوۡا شُہَدَآءَ عَلَی النَّاسِ ۚۖ فَاَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَاعۡتَصِمُوۡا بِاللّٰہِ ؕ ہُوَ مَوۡلٰىکُمۡ ۚ فَنِعۡمَ الۡمَوۡلٰی وَنِعۡمَ النَّصِیۡرُ ٪ ۝

এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (তাঁর দীনের জন্য) মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। নিজেদের পিতা ইবরাহীমের দীনকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। তিনিই পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম এবং এ কিতাবেও (অর্থাৎ কুরআনেও), যাতে

এই রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারে আর তোমরা সাক্ষী হতে পার অন্যান্য মানুষের জন্য। সুতরাং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আকড়ে ধর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। দেখ কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা হাজ্জ আয়াত -৭৮

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে( উম্মতে মোহাম্মদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মোহাম্মদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয়ই নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, উম্মতে মোহাম্মদ এর উপর একটা আল্লাহর বড় নিয়ামত। এ নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামাজ কায়েম করা , যাকাত আদায় করা এবং তাকে মজবুতভাবে ধারণ করার আদেশ করেছেন।

এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এই নিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায় করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারন করা।

অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।-সূরা ইবরাহীম : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি নবীজীকে নামাযের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ  اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।
-সূরা বনী ইসরাঈল  : ৭৮

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্ কোন্ নামায বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও নাএশার নামায। আর ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে।

নবীজীকে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

এবং তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।-সূরা হূদ  : ১১৪

দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে  নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহে পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।

আমরা লক্ষ করে এখানে নামাযের আদেশ করা হয়েছে, সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, পুণ্য পাপকে দূর করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় নামায খুব মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং এর দ্বারা গোনাহ মাফ হবে।

নবীজীকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

أُتْلُ مَآ أُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْن.َ

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।
-সূরা আনকাবুত : ৪৫

এখানেও নামাযের আদেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। হাঁ, নামাযের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। তবে প্রাণবন্ত নামায হতে হবে। যেরূপ নামাযের কথা কুরআন ও হাদীস বলে।

কুরআন হুকুম-আহকাম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত পুংলিঙ্গের সম্বোধন করে। দ্বিমত নেই যে, পুরুষের মত মহিলারাও এসব আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। কুরআনে এক স্থানে নবীপত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশও রয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েম কর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে।
-সূরা আহযাব : -৩৩

আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আদেশকারীর মর্যাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতে গুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড় এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন, সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্নীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি।

## পূর্ববর্তী নবীদের নামাজের নির্দেশ:

কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও দিয়েছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নামাযও ওসব বিষয়ের অন্যতম, যার বিধান আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকেও দান করেছেন (যদিও নামাযের সংখ্যা ও বিস্তারিত পদ্ধতি এক রকম ছিল না)।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ.-এর আলোচনা করে বলেন-

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে। আর তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।-সূরা আম্বিয়া : ৭৩

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল। তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার জন্ম হয়েছে। তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির যবান খুলে দিলেন। দোলনার শিশু ঈসা মাসীহ বলতে শুরু করলেন-

اِنِّیْ عَبْدُ اللهِ اٰتٰنِیَ الْکِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَکًا اَیْنَ مَا کُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّکٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا.

আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা। আর আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।-সূরা মারইয়াম : ৩০-৩৩

এখান থেকে এটা যেমন জানা গেল যে, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল, তেমনি এও বোঝা গেল যে, নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো দোলনার শিশুর যবান দিয়ে আল্লাহ যে কটি কথা বলিয়েছেন তাতে নামায স্থান পেয়েছে। ঈসা মাসীহের এ বাণী থেকে আরো জানা গেল, যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।

মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান থেকে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এলেন। আসলে এটা জাগতিক আগুন ছিল না। এটা ছিল আল্লাহর নূর। কাছে আসার পর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন-

اِنِّیْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى اِنَّنِیْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ.

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোন। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।-সূরা ত্বহা : ১২-১৪

আয়াতের শৈলী থেকে বোঝা যায়, এখানেই মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওত দান করা হয়। তো নবুওতের সূচনাতেই তাঁকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম ইবাদত। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। হাঁ, নামায আগাগোড়া আল্লাহর যিকির এবং এতে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। এটা নামাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য। নামায ছাড়া অন্য কোনো বিধান এমন নেই, যা আদ্যোপান্ত আল্লাহর যিকির এবং যেখানে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। শুধু তাই নয়; নামাযে রয়েছে বিভিন্ন অবস্থার যিকির- দাঁড়িয়ে যিকির, বসে যিকির, মাথা ঝুঁকিয়ে যিকির, মাটিতে লুটিয়ে যিকির। আল্লাহর বড়ত্বের যিকির, গৌরবের যিকির, পবিত্রতার যিকির, হামদ ও ছানার যিকির, প্রার্থনা ও নিবেদনের যিকির...।

আমাদের উচিত যিকিরপূর্ণ এ ইবাদতটি মহব্বত ও মনোযোগের সাথে আদায় করা; অলসতা ও উদাসীনতার সাথে নয়। যিকিরের সঙ্গে কি উদাসীনতা মানায়?

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়ি কর এবং তোমাদের ঘরসমূহকে নামাযের স্থান বানাও এবং নামায কায়েম কর আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।

-সূরা ইউনুস (১০) : ৮৭

এখান থেকে জানা গেল, মূসা আ. ও হারূন আ.-সহ তাঁদের গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল। আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নামায আদায় করতে হবে। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। প্রতিকূলতা দূর হবে।

কতিপয় তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে মূসা আ. ও হারূন আ.-কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটা তখনকার কথা যখন বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এবং ইবাদতখানায় নামায আদায়ে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তখন তাদেরকে নামায তরক না করে ঘরেই আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নবীদের উপর যখন নামাযের বিধান ছিল তো তাঁদের উম্মতেরা অবশ্যই এর আওতাভুক্ত ছিল। বিশেষত সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নামাযের বিধান দেওয়ার বিষয়টি কুরআন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারিত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান

আন, তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর এর পরও তোমাদের মধ্যে যে কুফর অবলম্বন করবে, নিশ্চয় সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

-সূরা মায়েদা : ১২

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাযের বিধান ছিল। সেইসঙ্গে এটাও জানা গেল যে, নামাযসহ উপরিউক্ত আমলগুলো করলে আল্লাহর সঙ্গ লাভ হবে। গোনাহ মাফ করা হবে এবং জান্নাত দান করা হবে।

## নামায মুমিনদের বৈশিষ্ট্য:

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْن.َ

তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।

-সূরা মায়েদা : ৫৫

এখানে মুমিনদের বন্ধু কারা এ প্রসঙ্গে কেবল তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়েছে : ক. আল্লাহ। খ. রাসূল। গ. মুমিনগণ। তারপর এই মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ আরো বলেন-

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْن.

ত্ব-সীন। এ কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।-সূরা নামল : ১-৩

এ আয়াতেও মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে নামাযের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْم.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবেরই উপর ভরসা করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।-সূরা আনফাল - ২-৪

এখানে সত্যিকার মুমিনদের গুণাবলি কী তা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা গেল সত্যিকার মুমিন হতে হলে নামায আদায় করতে হবে। নামায ছাড়া সত্যিকার মুমিন হওয়া যাবে না।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْن

يَرِثُوْنَ الفردوس هم فيها خالدون.

নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

-সূরা মুমিনুন : **১-১১**

এ আয়াতে সফল মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা তাদের নামাযে বিনীত (خٰشِعُوْن)।

এ শব্দটি خُشُوْع থেকে নির্গত। خُشُوْع শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনয়। কখনো ভয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে এ বিষয়গুলো কাছাকাছি।

خُشُوْع কুরআনে একাধিক স্থানে অন্তরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সফল মুমিন তারা, যারা নামাযে পরিপূর্ণরূপে বিনীত, আন্তরিকভাবেও এবং শারীরিকভাবেও। তাদের বিনয় অন্তর-জগৎকে ছাড়িয়ে দেহ-জগৎকে প্লাবিত করে। তাদের বিনয় ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে বহিরঙ্গকে আলোকিত করে।

বিনয় মানে কী আমরা সবাই জানি- নিজেকে ছোট মনে করা। তো বিনয়ের সঙ্গে নামায পড়ার অর্থ হল নিজেকে ছোট, দুর্বল, অসহায় ও মুখাপেক্ষী মনে করে আর আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মনে করে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর সম্মুখে নিজের বন্দেগী নিবেদন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর জন্য দেহমনের উপস্থিতির বিকল্প নেই।

সফল মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হল তারা তাদের নামাযমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। এই যত্নের মধ্যে সময়মত নামায পড়া, নিয়মিত নামায পড়া এবং নিয়মনীতি, হক ও আদবসমূহ লক্ষ করে নামায পড়া সবই শামিল।

অপর সূরায় আল্লাহ নামাযীদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেছেন-

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْن. َ

যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। এবং যাদের সম্পদে আছে নির্ধারিত হক, যাচক ও বঞ্চিতের জন্য। এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় থাকা যায়। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী বা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা (এ ক্ষেত্রে) তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা আপন সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে। এবং যারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। তারা জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।

-সূরা মাআরিজ : ২৩-৩৫

এখান থেকে আমরা প্রকৃত নামাযীর পরিচয় জানতে পারলাম। প্রকৃত নামাযী হচ্ছে যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি বিরাজমান থাকে, যেগুলোর শীর্ষে রয়েছে নিয়মিত নামায পড়া এবং যত্নের সাথে নামায পড়া।

মজার ব্যাপার এই যে, সূরা মুমিনুনে উল্লেখিত সফল মুমিনের সাতটি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সম্পর্কিত। এমনিভাবে সূরা মাআরিজে উল্লেখিত নামাযীর নয়টি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সংক্রান্ত এবং উভয় সূরায় গুণগুলোর আলোচনা শুরু হয়েছে নামায দিয়ে এবং শেষও হয়েছে নামায দিয়েই। এ থেকে অনুমেয়, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈমানের সাথে এর কী গভীর সম্পর্ক।

## সাহাবীদেরকে নামাযে উৎসাহদান:

হযরত রাবীআ ইবনে কা'ব আলআসলামী রা. বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত্রি যাপন করলাম। তখন আমি তাঁর কাছে ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে কোনো কিছু চাও।

আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করছি।

তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু?

আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বললেন-

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود.

তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদা (তথা নামায) আদায়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮৯

অর্থাৎ সিজদা ও নামায আদায়ের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একবার সাওবান রা.-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাআলাকে সিজদা কর। নিশ্চয় তুমি একবার আল্লাহ তাআলাকে সিজদা করলে তিনি তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮৮

## নবীজীর (সা) এর নামায-

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও মুহাববত সবচেয়ে বেশি নামাযের মাধ্যমে, বিশেষত নফল নামাযের দ্বারা অর্জিত হয়। এজন্য নামায সঠিকভাবে আদায়ের সাথে সাথে অন্তরে নামাযের প্রতি মুহাববত ও ভালবাসা তৈরি করা জরুরি। নামাযের প্রতি মুহাববতের কারণেই আল্লাহর প্রকৃত নেক বান্দাগণ যখন নামাযে দাড়ান তখন তাদের দিলের সব অস্থিরতা ও পেরেশানি দূর হয়ে যায়। হৃদয় ও মন শান্ত ও প্রশান্ত হয়। দিলে সুকূন ও সাকীনা অনুভব করেন। অপরদিকে কোনো কারণে নামায আদায়ে বিলম্ব হলে কিংবা কোনো অসুবিধা হলে তারা অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়েন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি  যখন নফল নামাযে দাঁড়াতেন তখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ কিরাত পড়তেন। কখনও কখনও প্রথম রাকাতে সূরা বাকারা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল ইমরান, তৃতীয় রাকাতে সূরা নিসা এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা মায়িদা পড়তেন। তিলাওয়াত করতেন তারতীলের সাথে। রহমতের আয়াত এলে থেমে রহমতের জন্য দুআ করতেন, আযাব ও শাস্তির আয়াতে পৌঁছলে আযাব থেকে পানাহ চাইতেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে

থাকতে পা ফুলে যেত, কিন্তু তিনি নামাযের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন যে, সেদিকে তাঁর কোনো খেয়ালই হত না।

তদ্রূপ নামায পড়ায় ব্যঘাত সৃষ্টি হলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন।

মক্কার লোকদের সাড়া না পেয়ে অনেক আশা নিয়ে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ গেলেন তখন তারা মক্কাবাসীদের চেয়েও অধিক নির্দয়তার পরিচয় দিল এবং কুরায়েশদের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুরতা দেখাল। নবীজী যখন ভগ্নহৃদয়ে ফিরে আসছিলেন তখন তারা দুষ্কৃতিকারী ও বদমাশদের লেলিয়ে দিল। তারা পাথর ছুড়ে ছুড়ে নবীজীর দেহ মুবারক রক্তাক্ত করে ফেলল। সেই সঙ্গীন মুহূর্তেও দয়ার নবী তাদের জন্য কোনো বদদুআ করেননি; বরং ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এরা আমাকে চিনতে পারেনি, আমার দাওয়াত বুঝতে পারেনি। এদের ভবিষ্যত প্রজন্ম আমার ডাকে সাড়া দিবে, আমার দাওয়াত কবুল করবে। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে যখন তাঁর আসরের নামায কাযা হয়ে গেল, কাফেররা তাঁকে সময়মতো নামায পড়তে দিল না তখন তাঁর যবান মুবারক থেকে কঠিন বদ দুআ বের হয়ে এল। তিনি বললেন, 'আল্লাহ এদের ঘরগুলো ও কবরগুলোকে আগুন দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন।' সূর্য ডুবে গেল অথচ এরা আমাদেরকে সালাতুল উসতা (আসরের নামায) পড়তে দিল না।
(সহীহ বুখারী ১/৪১০; সুনানে তিরমিযী ২/১২৭)

আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন-

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। (এত দীর্ঘ নামায পড়তেন যে,) তাঁর উভয় পা ফুলে যেত। তখন আয়েশা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন (এত কষ্ট) করেন কেন? আল্লাহ তাআলা তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!

তিনি বললেন, আমি কি শোকরগুযার বান্দা হতে চাইব না?

-সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭

এছাড়া যখনই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

বর্ণিত হয়েছে।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ،صَلَّى.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হতেন নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

সুনানে আবু দাউদ, হাদীস **১৩১৯**

নামাযে তিনি যে শান্তি ও তৃপ্তি পেতেন সেকথাও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন-

يا بلالُ، أقِمِ الصَّلاةَ، أرِحْنا بها.

বেলাল! নামাযের ব্যবস্থা কর। নামাযের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্ত কর।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫।

সর্বপরি তিনি বলেন,

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাযে।
-সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৯৪

# সাহাবায়ে কেরামের কাছে নামাযের গুরুত্ব:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে যেমন গুরুত্ব দিতেন, নামাযের প্রতি যেমন আগ্রহ ও অনুরাগ পোষণ করতেন সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও ছিল তেমনি। নামাযকে তারা মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। নামাযকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন, নামায ঠিক থাকলে অন্যান্য কাজকর্ম ঠিক থাকবে। নামাযে ক্রুটি থাকলে অন্যান্য কাজকর্মেও ক্রুটি ও অবহেলার আশঙ্কা থাকবে।

হযরত আবু বকর রা.-এর নামাযে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমন নিশ্চুপ ও নিশ্চল হয়ে থাকতেন, মনে হত, একটি কাঠ মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর রা.কে যখন কুখ্যাত আবু লূলূ খঞ্জর দিয়ে আহত করে তখন তিনি বারবার বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থায় কেউ তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ নামায পড়ে নিলেন এবং বললেন, 'আমি যদি নামায পড়তেই অক্ষম হয়ে যাই তবে বেঁচে থেকে আর লাভ কী?'

## এক যুদ্ধের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা দুজন সাহাবীকে পাহারার দায়িত্ব দিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন মুহাজির অপরজন আনসারী। দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের একজন রাতের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পাহারা দিবে অপরজন বিশ্রাম নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় জন উঠে পাহারা দিবে আর প্রথম জন বিশ্রাম নিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতের প্রথমভাগে আনসারী সাহাবী পাহারা দেওয়া শুরু করলেন এবং মুহাজির সাহাবী শুয়ে পড়লেন। আনসারী সাহাবী ভাবলেন শুধু বসে না থেকে বরং নামায পড়ি। নামায শুরু করার পর শত্রুশিবির থেকে এক কাফের এসে তাঁকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তীর ছুড়ল। তিনি অবিচল দাড়িয়ে থাকলেন। ঐ দুশমন মনে করল তীর হয়তো ঠিকমতো লাগেনি। তাই সে আবার তীর ছুড়ল। এদিকে ঐ সাহাবী একভাবেই দাড়িয়ে রইলেন। ওদিকে ঐ দুশমনও একের পর এক তীর ছুড়তে লাগল। আর তা সাহাবীকে বিদ্ধ করতে থাকল।

সাহাবী ধীরস্থিরভাবে রুকু-সেজদা আদায় করে যথারীতি নামায শেষ করলেন এবং মুহাজির সাথীকে জাগ্রত করলেন। মুহাজির সাহাবী তাঁর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং ঘটনা শুনে বললেন, তুমি আমাকে আরো আগে কেন জাগ্রত করনি? আনসারী উত্তর দিলেন, আমি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলাম, শেষ না করে রুকুতে যেতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু পরে আশঙ্কা হল আমার গায়ে যেভাবে তীর বিদ্ধ হচ্ছে তাতে যেকোনো অবস্থায় আমি শহীদ হয়ে যেতে পারি। আর তোমাকে জাগানোর আগেই যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে পাহারা দিতে বলেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে ফেলেছি। যদি এ আশংকা না হত তাহলে সূরা শেষ না করে আমি রুকুতে যেতাম না। যদিও আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাক না কেন?

আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রা. একবার ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে ফরমান পাঠালেন। সেখানে লিখলেন-

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামায। যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হবে এবং গুরুত্বের সাথে নামায আদায় করবে সে তাঁর দ্বীনকে হেফাযত করবে। আর যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করবে (নামাযের ক্ষেত্রে অবহেলা করবে) সে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অধিক নষ্টকারী (অবহেলাকারী) হয়ে থাকবে।
-মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬

## হযরত আবু তালহা (রা) এর ঘটনা

তিনি একবার তাঁর ফল বাগানে নামাজ পড়ছিলেন। ইত্যবসরে একটি পাখি বাগানের ভিতর এসে উড়াউড়ি করতে শুরু করলো। তাঁর দৃষ্টি সে দিকে চলে যায়। এবং দীর্ঘ সময় তিনি পাখির উড়াউড়ি দেখতে থাকেন। এতে নামাজ থেকে তাঁর মন চলে যায় এবং নামাজে ভুল হয়ে যায়। কোন রাকাআত পড়েছিলেন তা ভুলে যান।
হযরত আবু তালহা আনসারী (রা) সাথে সাথে রাসুল সাঃ এর খেদমতে হাজির হন। এবং আরয করলেন,"এই বাগানের কারণে আমার নামাজে বিঘ্ন ঘটেছে, আমি এ বাগান রাখতে চাই না। আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। আপনি যেখানে ইচ্ছা ব্যবহার করুন"।
সীরাত গ্রন্থ থেকে জানা যায় হযরত আবু তালহা (রা) এর বাগান কয়েক লক্ষ দিরহাম এর সম্পদ ছিল।

## হযরত খুবাইব (রা) এর প্রসিদ্ধ ঘটনা

হযরত খুবাইব রা. কাফেরদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর দীর্ঘদিনবন্দী থাকেন। এরপর তাঁকে হত্যা করার জন্য শূলীতে চড়ানোর পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তোমার কোন বিশেষ ইচ্ছা থাকলে বলতে পারো। তিনি বললেন,"একটি বিশেষ ইচ্ছে আমার আছে,"যা তোমরা পূরণ করতে পারো। সেটা হলো, ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেওয়ার পূর্বে এবং মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার আগে তোমরা যদি আমাকে সুযোগ দাও তাহলে আমি দু' রাকাত নামাজ পড়বো"।
তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে এবং খুশু-খুযুর সহি দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন এবং বলেন আমার যদি এই ধরনের ধারণা না হতো যে তোমরা মনে করবে আমি মৃত্যুর ভয়ে দেরি করছি, তাহলে আমি আরো দু'রাকাত নামাজ পড়তাম। যাই হোক এরপর তাঁকে শূলীতে চড়ানো হয়।

হাদিস ও সীরাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এগুলো খুবই প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই ঘটনাগুলো দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নামাজের সাথে তাঁদের ভালোবাসা ও টান কত গভীর ও নিবিড় ছিল।

নবীজীর সাহাবীরা তো নামায বিহীন জীবনকে অনর্থক মনে করতেন। নামাযের মধ্যে সামান্য অমনোযোগিতার কারণে তাঁরা লক্ষ টাকার বাগান সদকা করে দিতেন। কিন্তু হায়! আমরা তো এতই হতভাগা যে, চক্ষুর শীতলতা লাভ করা তো দূরের কথা, তাঁরা যেমন প্রশান্তি লাভ করতেন, তার মর্ম উপলব্ধি করতেও আমরা অক্ষম। অন্তত তাঁদের বরকতময় ঘটনাগুলো পড়া ও স্মরণ করার দ্বারা দিলের মধ্যে যদি সামান্য উত্তাপ তৈরি হয় তাতেই বা কম কী?

## তাবিয়ীন ও তাবে তাবিয়ীন যুগে নামাজ:

সাহাবায়ে কেরাম থেকে দ্বীন শিখেছেন তাবিয়ীনে কেরাম। সাহাবায়ে কেরামকে দেখে দেখে তারা তাদের জীবন সাজিয়েছেন। তাঁদেরকে অনুসরণ করে করে জীবন গড়েছেন। তাই সাহাবায়ে কেরামের ছাপ ফুটে উঠেছে তাবিয়ীনে কেরামের মাঝে। জীবন যাপনের বাহ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-ইবাদতের ক্ষেত্রেও।

বিখ্যাত তাবিয়ী সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহ. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

مَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا وَسَعِيدٌ فِي الْمَسْجِدِ.

চল্লিশ বছর ধরে অবস্থা এমন ছিল যে, আযান হচ্ছে আর সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) মসজিদে নেই- এমনটি ঘটত না।

-হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/১৬৩; কিতাবুস সিকাত ইবনে হিব্বান ৪/২৭৪

ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রাহ. বলেন-

كَانَ الأَعْمَشُ قَرِيْباً مِنْ سَبْعِيْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتْهُ التَّكْبِيْرَةُ الأُوْلَى.

প্রায় সত্তর বছর যাবৎ আ'মাশ রাহ. এর তাকবীরে উলা ছোটেনি।
-তারীখে বাগদাদ ১০/৫, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/২২৮

ফিকহে হানাফীর বড় একজন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সামাআ রাহ. (২৩৩ হি.) বলেন-

مَكَثْتُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتْنِي التَّكبِيرَةُ الأُوْلَى، إلاَّ يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في جماعة.

চল্লিশ বছর যাবৎ আমার তাকবীরে উলা ছোটেনি, একদিন ছাড়া; সেদিন আমার মায়ের ইন্তিকাল হয়। তাই এক ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করতে পারিনি।
-তারীখে বাগদাদ ৫/৩৪৩, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৬৪৬

## নামাজের প্রতি পরবর্তী যুগের আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসা ও টান

সাবেত বুনানী (র) নামে একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সবসময় দোয়া করতেন। হে' আল্লাহ! তুমি যদি কাউকে কবরে নামাজ পড়ার ইজাযত দাও, তবে আমাকে দিও'।

ইমাম রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী( র.) মসুর খলিফা খাজা আব্দুল ওয়াহিদ লাহুরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন বলেন-

"জান্নাতে কি নামাজ পড়ার সুযোগ হবে?"
উপস্থিত এক ব্যক্তি বলেন, হযরত! জান্নাত তো দারুল জাযা, পুরস্কার প্রাপ্তির স্থান। সেটাতো আমল করার জায়গা নয়। সেখানে নামাজ হবে কিভাবে? এ কথা শুনে তিনি খুবই ব্যথিত হলেন এবং কেঁদে কেঁদে বললেন-
"নামাজ ছাড়া তাহলে সেখানে থাকবো কিভাবে?"

আল্লাহওয়াআলাদের জীবনীতে নামাজের প্রতি তাদের ভালোবাসা, টান ও আসক্তির অসংখ্য শিক্ষনীয় বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে।

নামাযের ব্যাপারে এমনই ছিলেন আমাদের সালাফে সালিহীন। নামাযের ব্যাপারে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামে। তাই আমাদের জীবনেও নামাযের বিষয়ে এমন যত্ন ও গুরুত্ব থাকা উচিত।

## খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাযের গুরুত্ব

নামাযে খুশূ-খুযূ মুমিনের গুণ। পক্ষান্তরে খুশূ-খুযূ বিহীন অলসতার সাথে নামায মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য।
এই খুশূ-ই হচ্ছে নামাযের রূহ। আসলে খুশূ মুমিনের সবসময়কার অবস্থা। এখানে বিশেষভাবে নামাযের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, নামায হচ্ছে খুশূর প্রকাশের সর্বোত্তম জায়গা।

আর খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাযই নামাযীকে সকল অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

আসলে মুমিনের নামায খুশূ-খুযূ বিহীন হতেই পারে না; কারণ সে তো মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কি দেহ-মন বিনীত না হয়ে পারে? আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কি মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে পারে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী অপূর্ব শৈলিতে এ কথায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبّهُ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيه.

তোমাদের কেউ যখন নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করে। সুতরাং তার উচিত সে কিভাবে আলাপ করছে সেদিকে যথাযথভাবে লক্ষ রাখা।

-মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৮৬১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ৪৭৪

হযরত সা'দ বিন উমারাহ রা. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ.ٍ

যখন তুমি সালাত আদায় কর, তো এমনভাবে আদায় কর যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত।

-আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, বর্ণনা ৫৪৫৯; আলইছাবা, ইবনে হাজার ৩/৭০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হায়ছামী ১০/২৩৬, বর্ণনা ১৭৭৩৯

প্রসিদ্ধ হাদীস 'হাদীসে জিবরীল'-এ সকল ইবাদতের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে ফুটে উঠেছে খুশূ-খুযূর চূড়ান্ত রূপ-

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.َ

ইহসান হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত  এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তো (অবশ্যই) তোমাকে দেখছেন।

-সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০

এই হাদীসের মূল কথাও 'খুশূ'। সুতরাং কথা এটাই যে, সালাতের চূড়ান্ত সুফল অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করতে হবে। খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাযই মুমিনকে সকল অন্যায়-অনাচার, অপকর্ম-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

## জামাতের গুরুত্ব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম। জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বর্তমানে অনেক নামাজি হয়তো সে সম্পর্কে জানেন না। অথবা অবহেলা ও অলসতাবশতঃ তার প্রতি গুরুত্ব দেন না।

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ
জামা‘আতে সালাতের ফাযীলত একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী।

(৬৪৯; মুসলিম ৫/৪২, হাঃ ৬৫০, আহমাদ ৫৩৩২)

আল্লাহ বলেন, ‘এবং (হে নবী,) আপনি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন ও তাদের নামাজ পড়ান, তখন (শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার সময় তার নিয়ম এই যে) মুসলিমদের একটি দল আপনার সঙ্গে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র সঙ্গে রাখবে। অতঃপর তারা যখন সেজদা করে নেবে, তখন তারা তোমাদের পেছনে চলে যাবে এবং অন্য দল, যারা এখনো নামাজ পড়েনি, সামনে এসে যাবে এবং তারা আপনার সঙ্গে নামাজ পড়বে। তারাও নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্র সঙ্গে রাখবে।’
(সুরা নিসা, আয়াত: ১০২)

উক্ত আয়াতে যুদ্ধাবস্থায় জামা‘আতে সালাত আদায়ের পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। যদি পরিবেশ শান্ত থাকাবস্থায় জামা‘আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে কোনো ছাড় থাকতো তথা তা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব হতো তা হলে যুদ্ধাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে জামা‘আতে সালাত আদায়ের পদ্ধতি শেখানোর কোনো প্রয়োজনই অনুভূত হতো না। বরং তারা উক্ত ছাড় পাওয়ার বেশি উপযুক্ত ছিলো। যখন তা হয় নি

তখন আমাদেরকে বুঝতেই হবে, জামা‘আতে সালাত আদায় করা নিহায়েত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। তাই ওযর ছাড়া কারোর জন্য ঘরে সালাত পড়া জায়িয নয়।

তেমনিভাবে উক্ত আয়াতে উভয় দলকেই জামা‘আতে সালাত আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে। যদি কেউ কেউ জামা‘আতে সালাত পড়লে অন্যদের পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে যেতো তাহলে উভয় দলকেই এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে জামা‘আতে সালাত আদায় করতে আদেশ করা হতো না। তাই জামা‘আতে সালাত পড়া প্রতিটি

যুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। মহানবী (স.) জামাতে নামাজ আদায়ে গাফিলতির ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন,
‘যে ব্যক্তি আজান শুনল এবং তার কোনো অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও জামাতে উপস্থিত হলো না, তার সালাত হবে না।’
(ইবনে মাজাহ: ৭৯৩)

যারা জামাতে শরিক হয় না তাদের সম্পর্কের রাসূল (সা.) একদিন কঠিন অসন্তোষ প্রকার করে বলেন,

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনিবলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَرَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىْ قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّار.«ِ

আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দেই এবং তাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করি। অতঃপর আমি কাষ্ঠ বহনকারী একটি দল আমার সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই যারা জামাআতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘর-বাড়ি জালিয়ে দেই।

-সুনানে আবু দাউদ -৫৪৮(বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, নাসাঈ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা‘আতে সালাত ত্যাগকারীদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো এতো বড়ো জঘন্য কাজ করার ইচ্ছা কখনোই পোষণ করতেন না যদি না জামা‘আতে সালাত পড়া একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হতো। আর যদি কেউ কেউ জামা‘আতে সালাত পড়লে অন্যদের পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে যেতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কিছু সাহাবীগণ জামা‘আতে সালাত আদায় করলেই অন্যদের পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে যেতো।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَه.»ُ

“যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয় নি অথচ তার কোনো ওযর নেই। তাহলে তার সালাতই হবে না”।

বায়হাকী, হাদীস নং ৪৭১৯, ৫৩৭৫।

উক্ত হাদীসদ্বয়ে জামা‘আতে সালাত না পড়লে সালাত কবুল বা শুদ্ধই হবে না বলতে কমপক্ষে জামা‘আতে সালাত পড়া ওয়াজিব হওয়াকেই বুঝানো হচ্ছে।

কোনো জায়গায় সালাতের সময় হলে এবং সেখানে তিন বা তিনের অধিক ব্যক্তি একত্রিত থাকলে তাদেরকে অবশ্যই উক্ত সালাত জামা‘আতে আদায় করতে হবে। এটিই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আদেশ। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ সাধারণত ওয়াজিব হওয়াকেই বুঝায়।

হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যত্নের সঙ্গে আদায় করবেন, কেয়ামতের দিন এ নামাজ তার জন্য আলো হবে। তার ঈমান ও ইসলামের দলিল হবে এবং তার নাজাতের ওসিলা হবে। আর যে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত নামাজ আদায় করবে না, কেয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নামাজ তার জন্য আলো হবে না। দলিলও হবে না এবং সে আজাব থেকে রেহাইও পাবে না।

(মুসনাদে আহমদ : ৬৫৭৬)

নামায যেন হয় আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন- আমীন।

## সালাতের ফজিলত

দুনিয়ার ভালো-মন্দ কর্মগুলো আখিরাতে পরিমাপ করা হবে। দুনিয়ায় যারা বেশি বেশি নেক আমল করবে। তারা কিয়ামতের কঠিন সময়ে সফলকাম হবে। কিয়ামত দিবসে পরিবার-পরিজন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। প্রত্যেকে নিজের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সে দিন শুধু দুনিয়ার নেক আমলের ওপর ভরসা করতে হবে।

কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لۡتَنۡظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ
﴿۱۸﴾يايها الذين امنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد ۚ و اتقوا الله ان الله خبيرۢ بما تعملون۱۸

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত।
(সূরা হাশর:১৮)

নামাযের ফাজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰی لِلذّٰكِرِیْنَ.

দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ। -সূরা হুদ : ১১৪

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নামায বহু পাপ মিটিয়ে দেয়।

আরো ইরশাদ করেছেন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.

এবং নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। -সূরা আনকাবূত : ৪৫

অর্থাৎ নামায আদায় করতে থাকলে একসময় এই নামাযই মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

এছাড়া আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য নামাযকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

وَ اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِیْرَةٌ اِلَّا عَلَی الْخٰشِعِیْنَ.

তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় সালাতকে কঠিন মনে হয়; কিন্তু তাদের পক্ষে নয়, যারা খুশূ (অর্থাৎ বিনয় ও মনোযোগ)-এর সাথে আদায় করে। -সূরা বাকারা : ৪৫

এখানে ধৈর্য ও নামাযের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্যের দৃঢ় আশ্বাস পাওয়া যায়।

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিদের প্রতিদান দেবেন। যারা দুনিয়াতে নামাজ কায়েম করেছে, জাকাত প্রদান করেছে, সে দিন তারা আনন্দ-উল্লাস করতে থাকবে। তাদের জাহান্নামের কোনো ভয় থাকবে না। আর দুনিয়ার বেনামাজিরা, সে দিন হা-হুতাশ করতে থাকবে।

পরকালে সাফল্যে লাভের চাবিকাঠি হলো নামাজ আদায় করা। পরকালে নাজাত পেতে হলে, দুনিয়ার জিন্দেগিতে নামাজের প্রতি যত্নবান হতে হবে। নামাজি ব্যক্তিরাই জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হবেন। কুরআনে এরশাদ হয়েছে,
'নিশ্চয়ই ওই সব ঈমানদার সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে খুশু-খুজুর সাথে আদায় করে।'
(সূরা মুমিনুন:১-২)।

'যারা নিজেদের সালাতের হেফাজত করে, এরাই আল্লাহর জান্নাতে মর্যাদাসহকারে প্রবেশ করবে।' (সূরা মা'আরিজ :৩৪-৩৫)।

'যারা তাদের সালাতসমূহের হিফাজতকারী, মূলত এরাই হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী এবং সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।'
(সূরা মুমিনুন: ৯-১১)।

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নামাযের কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ.

দ্বীনের প্রধান বিষয় হল ইসলাম। এর খুঁটি হল নামায। আর তার উচ্চচূড়া  হল জিহাদ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬১৬

এখানে নামাযকে বলা হয়েছে ইসলামের খুঁটি। যেকোনো অবকাঠামোর ক্ষেত্রে খুঁটির গুরুত্ব কতটুকু তা খুব সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা, ঈমানের পর নামাযই প্রথম। যেজন্য কুরআন-হাদীসে ঈমানের পর সর্বপ্রথম নামাযেরই উল্লেখ বারবার। আখেরাতেও সর্বপ্রথম বিষয় নামায।

হাদীস শরীফে এসেছে-

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাযের।
-জামে তিরমিযী, হাদীস ৪১৭; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৬৬

বোঝা গেল, দুনিয়াতে যেমন, তেমনি আখেরাতেও নামাযের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা উচ্চারণ করে বলা হয়েছে-

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

নিশ্চয় একজন মানুষ ও কুফর-শিরকের মাঝে পার্থক্য হল নামায।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮২।

নামাজের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে আখিরাতে অপূরনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। নামাজের গুরুত্ব এতটাই যে মুসলমান ও অন্য ধর্মের লোকদের মধ্যে পার্থক্যই হলো নামাজ।
এ আমলে অবহেলা যেমন বড় অন্যায়, যথাযথ আদায়ে নেকী ও প্রাপ্তিও অনেক বড়। এর মাধ্যমে বান্দার গোনাহ ধুয়ে-মুছে যায়।

যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, তাদের আমলনামায় কোনো গোনাহ থাকবে না। নামাজ বান্দার আমলনামা থেকে গোনাহগুলোকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীগণের উদ্দেশে) বললেন, আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার কাছে যদি একটি নদী থাকে, যাতে সে নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়কারীর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

[1] সহীহ : বুখারী ৫২৮, মুসলিম ৬৬৭, নাসায়ী ৪৬২, তিরমিযী ২৮৬৮, আহমাদ ৮৯২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭২৬, ইরওয়া ১৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫২।

অর্থাৎ নিয়মিত নামায পড়তে থাকলে নামাযী হবে পবিত্র ও গোনাহমুক্ত। তবে কবীরা গোনাহ হলে অবশ্যই তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা চাইতে হবে।

রাসূল( সা.) বলেছেন,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرِ.َ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান- মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে মিটিয়ে দেয়। কবীরা গোনাহ ছাড়া। -সহীহ মুসলিম-৪৩৮

নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে, আখিরাতে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।নামাজের গুরুত্ব এতটাই যে, মুসলমান ও অন্য ধর্মের লোকদের মধ্যে পার্থক্যই হলো নামাজ।

হজরত হানজালা উসাঈদী রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসূল সা: এরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথ পাবন্দীর সাথে আদায় করে, উত্তমরূপে অজু করে, সময়ের প্রতি খেয়াল রাখে, রুকু-সিজদা ঠিকমতো আদায় করে এবং এভাবে নামাজ আদায়কে নিজের ওপর আল্লাহ তায়ালার হক মনে করে, তবে জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দেয়া হবে"। ( মুসনাদে আহমাদ-৪: ২৬৭পৃ.)।

## নামাজের প্রতি মুহাব্বত:

নামাযের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। মাসায়িল মোতাবেক নামাযের রোকনগুলো আদায় করার পাশাপাশি  অন্তরের ইখলাস ও খুশু-খুযূ এবং নামাযের প্রতি মুহাববত নামাযের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপরিহার্য। এই পূর্ণাঙ্গ নামাযের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির নিকটতম সম্পর্ক তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও মুহাববত লাভের এবং প্রেমাষ্পদের সঙ্গে যোগাযোগ ও কথোপকথনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম নামায।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- (তরজমা) ‘আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায পড়।’ (সূরা ত্বহা : ১৪)

এক হাদীসে কুদসী থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও মুহাববত সবচেয়ে বেশি নামাযের মাধ্যমে, বিশেষত নফল নামাযের দ্বারা অর্জিত হয়। এজন্য নামায সঠিকভাবে আদায়ের সাথে সাথে অন্তরে নামাযের প্রতি মুহাববত ও ভালবাসা তৈরি করা জরুরি। নামাযের প্রতি মুহাববতের কারণেই আল্লাহর প্রকৃত নেক বান্দাগণ যখন নামাযে দাড়ান তখন তাদের দিলের সব অস্থিরতা ও পেরেশানি দূর হয়ে যায়। হৃদয় ও মন শান্ত

ও প্রশান্ত হয়। দিলে সুকূন ও সাকীনা অনুভব করেন। অপরদিকে কোনো কারণে নামায আদায়ে বিলম্ব হলে কিংবা কোনো অসুবিধা হলে তারা অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়েন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি বলেছেন,
- নামাযে আমার চোখের শীতলতা।

অন্য এক হাদীসে হযরত বেলাল রা.কে আদেশ করেছেন,
'হে বেলাল! নামায কায়েম করে আমাদেরকে প্রশান্তি দাও।' (সুনানে আবু দাউদ ২/৬৮১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নফল নামাযে দাঁড়াতেন তখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ কিরাত পড়তেন। কখনও কখনও প্রথম রাকাতে সূরা বাকারা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল ইমরান, তৃতীয় রাকাতে সূরা নিসা এবং চতূর্থ রাকাতে সূরা মায়িদা পড়তেন। তিলাওয়াত করতেন তারতীলের সাথে। রহমতের আয়াত এলে থেমে রহমতের জন্য দুআ করতেন, আযাব ও শাস্তির আয়াতে পৌঁছলে আযাব থেকে পানাহ চাইতেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফুলে যেত, কিন্তু তিনি নামাযের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন যে সেদিকে তাঁর কোন খেয়ালই হত না।

নামাযের আদ্যোপান্ত নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়, নামায কত বড় প্রভাবক বিষয়। মুমিন যদি সচেতনভাবে নিয়মিত নামায আদায় করে, তাহলে অবশ্যই নামায তাকে ভেতরে-বাইরে উন্নত থেকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাবে। নামাযের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করুন :

## ∆∆নামায হচ্ছে পবিত্রতা

নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য। তাহলে নামায আদায়ের শুরু পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন।

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَي الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَي الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَي الْكَعْبَيْنِ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓي اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن.َ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের উদ্দেশ্যে ওঠো তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুইসহ হাত ধৌত করবে। তোমাদের মাথায় মাসেহ করবে এবং পা টাখনুসহ (ধৌত করবে)। আর যদি গোসল জরুরি এমন নাপাক অবস্থায় থাক, তাহলে সমধিক পবিত্রতা অর্জন করবে (গোসল করবে)। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে কিংবা স্ত্রী সহবাস কর; অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করবে; তা দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনোরূপ কষ্ট আরোপ করতে চান না, তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর দান পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা শোকর কর।
-সূরা মায়েদা : ৬

ওযু-গোসলের বিধান পবিত্রতার জন্য। তবে এর মাধ্যমে যে পরিচ্ছন্নতাও অর্জিত হয় তা তো খুবই স্পষ্ট। ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হচ্ছে মিসওয়াক, যা ওযুর সময় আরো তাকীদপূর্ণ। মিসওয়াকের তাৎপর্য উল্লেখ করে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে।

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّب.ِّ

মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা (পরিচ্ছন্নতা) ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়।

সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫

আমরা জানি, মানুষের উন্নত জীবনের অনুষঙ্গগুলোর একটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। ইসলামী জীবনধারায় তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ ইসলামে ফরজ-নফল সবধরনের নামাযে পবিত্রতা অপরিহার্য। আর আগে বলা হয়েছে, ওযু-গোসলের বিধানের অন্যতম সুফল ও তাৎপর্য হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। কাজেই নিয়মিত নামায আদায়কারী যখন নিজেকে পাক-পবিত্র রাখবে তখন এর মধ্য দিয়ে তার মধ্যে পরিচ্ছন্নতার স্বভাবও তৈরি হবে।

উল্লেখ্য, পবিত্রতা সাধারণ পরিচ্ছন্নতার চেয়ে উন্নত বিষয়। ইসলামে পবিত্রতার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার ন্যূনতম সুফলটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা, যা সভ্য জীবনের অতি বড় অনুষঙ্গ।

পবিত্রতার দ্বারা শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতাই নয়, পাপের কালিমা থেকেও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। হাদীস শরীফে পবিত্রতার এই সুফল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَه خَرَجَ مِنْ وَجْهِه كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْه مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

কোনো মুমিন বান্দা যখন ওযু করে, ওযুতে সে যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল থেকে পানির সাথে ঐসব গোনাহ ঝরে পড়ে, যার দিকে সে দুই চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল। এরপর যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন দুই হাত থেকে পানির সাথে ঐসকল গোনাহ ঝরে পড়ে, যা সে হাত দিয়ে করেছিল। এরপর যখন সে দুই পা ধৌত করে তখন পানির সাথে ঐসকল গোনাহ বের হয়ে যায়, যার মধ্যে সে পা দিয়ে চলেছিল। পরিশেষে সে গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৪

উসমান ইবনু আফফান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

যে ওযু করে ও উত্তমরূপে ওযু করে, তার শরীর থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৫

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়ের দিকে নির্দেশনা দেব না, যারা দ্বারা আল্লাহ তাআলা গোনাহসমূহ মুছে দেবেন এবং মর্তবাসমূহ বুলন্দ করবেন?

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলুন।

তিনি বললেন, কষ্টের সময়গুলোতে পূর্ণ ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা। এই  হচ্ছে 'সীমান্ত প্রহরা'।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫১

সহীহ মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه، إِلاَّ فُتِحَتْ لَه أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

তোমাদের যে কেউ উত্তমরূপে ওযু করে বলবে।

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه.

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৪

তিরিমিযীর বর্ণনায় এই দুআয় কালেমায়ে শাহাদাতের সাথে এই কথাটুকুও আছে।

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِين.َ

ইয়া আল্লাহ! আমাকে অধিক তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
-জামে তিরমিযী, হাদীস ৫৫

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে সুন্নাহ মোতাবেক ওযু করার দ্বারা শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাই অর্জিত হয় না, গোনাহের কালিমা থেকেও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার অপার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

## ∆∆ নামায আল্লাহ তাআলার স্মরণ

আল্লাহর স্মরণ সকল পুণ্যের চাবিকাঠি, সকল পাপ থেকে বাঁচার উপায়। মানুষ যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় বা আল্লাহকে ভুলে যায় তখনই সে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়। মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ যত গভীর হবে, ততই তা জীবন ও কর্মকে পরিশীলিত করবে।

নামায হচ্ছে আল্লাহ তাআলার স্মরণের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে।

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى.

নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত করবে এবং আমার স্মরণে নামায আদায় করবে।
-সূরা ত্বহা : ১৪

বান্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাওহীদ অবলম্বন করা। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আকীদা-বিশ্বাসে সম্পূর্ণরূপে শিরক থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া এবং এক আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে মহিমান্বিত ইবাদত হচ্ছে নামায। বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে নামায আদায় করবে। নামাযেও আল্লাহকে স্মরণ করবে।

এই আয়াতে বর্ণিত সম্বোধন হযরত মূসা আ.-কে লক্ষ করে হলেও কুরআন মাজীদে তা বর্ণনার তাৎপর্য হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদীও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তে নামাযের যে ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তাতে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং তাঁর স্মরণে নামায আদায় করতে হবে। এর বাইরেও অন্যান্য সময় আল্লাহর স্মরণে নফল নামায আদায় করা, এমনকি কখনো নিদ্রা বা অন্য কোনো কারণে নামায কাযা হয়ে গেলে চেতন হওয়া মাত্র যখন নামাযের কথা মনে পড়ে তখন পবিত্র হয়ে নামায আদায় করাও এ আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

অন্য আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

أُتْلُ مَآ أُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ  اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ  وَ لَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ  وَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْن.َ

আপনার কাছে যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন এবং নামায আদায় করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। আর আল্লাহর স্মরণ তো সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।
-সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫

এই আয়াতে নামাযের দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নামায নামাযীকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় আর কুরআন মানুষকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। কারণ নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদা, নামাযের যিকির ও তাসবীহ নামাযীকে আল্লাহ তাআলার সাথে তার আব্দিয়াতের সম্পর্ক নবায়ন করে দেয়।

কাজেই যে নামাযের উচ্চারিত-অনুচ্চারিত বাণী শ্রবণ করে, সে বুঝতে পারে যে, নামায তাকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ। এটি আরো বড় বৈশিষ্ট্য। চিন্তা করলে বোঝা যাবে, নামাযী মুখ, অন্তর ও গোটা দেহের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণে নিবেদিত হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে নামায, যা মন-মস্তিষ্ক, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আলী রা. থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে পঠিত দুআর বৃত্তান্ত সম্বলিত একটি দীর্ঘ হাদীসে সিজদার দুআ সম্পর্কে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় বলতেন।

اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَه وَصَوَّرَه، وَشَقَّ سَمْعَه وَبَصَرَه، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِين.َ

ইয়া আল্লাহ! আপনারই জন্য সিজদা করেছি, আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, আপনারই সামনে অনুগত-সমর্পিত হয়েছি। আমার মুখমণ্ডল তাঁকেই সিজদা করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, রূপ দান করেছেন, এর চোখ-কান দিয়েছেন।প্রভূত বরকতময় আল্লাহ, সকল স্রষ্টার সর্বোত্তম স্রষ্টা।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭১

নামাযে রুকু-সিজদার তাসবীহ ও অন্যান্য রোকনের যিকির-তিলাওয়াতে আল্লাহ তাআলার স্মরণের অত্যন্ত গভীর উপাদান রয়েছে। নামাযী যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে, আল্লাহ

তাআলার বড়ত্ব ও মহত্বকে অন্তরে জাগ্রত করবে, ভেতর-বাইরে একাগ্র-একনিষ্ঠ থাকবে, নামায ততই পূর্ণাঙ্গ হবে এবং নামাযের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ততই অর্জিত হতে থাকবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহর স্মরণই অভিষ্ট লক্ষ্য এবং এটি ঐ মহান উপাদান, যা মানুষকে দুনিয়া-আখেরাতে মহা কল্যাণের অধিকারী করে এবং চূড়ান্ত অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে।

এখানে আরেকটি বিষয়ও রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাআলাও তাকে স্মরণ করেন। ইরশাদ হয়েছে।

فَاذْكُرُوْنِیْٓ اَذْكُرْكُمْ.

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ করব।
সূরা বাকারা : ১৫২

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে স্মরণ করার অর্থ, তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহে ভূষিত হওয়া, নূর, হেদায়েত, রহমত ও মাগফিরাত লাভ করা। আল্লাহ তাআলার এই মহা অনুগ্রহ যে বান্দার নিজের কর্ম থেকে অনেক অনেক বড় তা তো বলাই বাহুল্য। বান্দাও আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ্ও বান্দাকে স্মরণ করেন। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ বান্দার স্মরণের চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহান। আল্লাহ তাআলার দয়ায় বান্দা গোনাহ থেকে পাকসাফ হয়ে যায়।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذٰلِكَ؟ يُبْقِي مِنْ دَرَنِه؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِه شَيْئًا، قَالَ: فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

বল তো, তোমাদের কারো দরজায় যদি একটি নহর থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তাহলে কী বল, তার দেহে কি কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে

কেরাম বললেন, তার দেহে কোনো ময়লাই থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা।
-সহীহ বুখারী, হাদীস ৫২৮

## ∆∆নামাযে রয়েছে পঠন, শ্রবণ ও উপলব্ধি

নামায ধ্যান-খেয়ালের সাথে আদায় করা কাম্য। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ. ◌َ

নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা তাদের নামাযে বিনয়াবনত।
সূরা মুমিনুন (২৩) : ১-২

উসমান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

مَا مِن امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً،وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه.

যে মুসলিমের সামনে ফরয নামায উপস্থিত হয়, অতঃপর সে ভালোভাবে ওযু করে, খুশূ অবলম্বন করে, উত্তমরূপে রুকু করে, এই নামায তার পূর্বের গোনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়, যে পর্যন্ত সে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর এই পুরস্কার সবসময়ের জন্য।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৮

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ক্ষমা ও সাফল্য তাদের জন্য, যারা খুশূর সাথে নামায আদায় করে। খুশূ মূলত অন্তরের নম্রতা। আর এর বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা ও নম্রতার মধ্য দিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বান্দা তখনই নামাযে খুশূওয়ালা তথা বিনয়াবনত হয় যখন তার উপলব্ধিতে থাকে যে, সে মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়েছে। নামাযে যা বলা হয় এবং যা পড়া হয় তার দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট রাখে। আলেমগণ

বলেছেন, খুশূর প্রথম ধাপ হচ্ছে, নামাযে পঠিত বিষয়াদির দিকে ধ্যান রাখা। যা বলা হচ্ছে তা অন্তর থেকে বলা, যা পড়া হচ্ছে অন্তর থেকে পড়া। এভাবে মনোযোগের সাথে যখন নামাযপড়া হবে তখন তা মুমিনের সাফল্যের উপায় হবে। তার ঈমান বাড়তে থাকবে, ইলম বাড়তে থাকবে। অন্তরের অবস্থার উন্নতি হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্থিরতা আসবে এবং চিন্তা-চেতনায়, কাজ-কর্মে বিনয়, নম্রতা ও আল্লাহমুখিতা তৈরি হবে।

## ∆∆ নামায হচ্ছে দুআ

আরবী ভাষায় 'সালাত' শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ দুআ। কুরআন মাজীদেও 'সালাত' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে ইরশাদ হয়েছেÑ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُم.ْ

তাদের সম্পদ থেকে সদাকা গ্রহণ করুন; যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। আর তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তির উপকরণ। -সূরা তাওবা - **১০৩**

নামাযকে 'সালাত' নামে নামকরণের  অন্যতম কারণ নামাযের তিলাওয়াত ও যিকির-তাসবীহতে দুআর উপস্থিতি।

ইমাম নববী রাহ. বলেন,

هذا قول جماهير أهل اللغة العربيّة والفقهاء وغيرهم.

এটি অধিকাংশ আরবী ভাষাবিদ, ফিকহশাস্ত্রবিদ ও অন্যদের বক্তব্য।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, নামাযের সিংহভাগ বিষয়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুআ। সূরাতুল ফাতিহা, যা প্রতি নামাযে অবশ্যপঠনীয়, তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে সরল পথের প্রার্থনা ও দুআ।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন।

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

আমি সালাতকে (অর্থাৎ, সূরাতুল ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধাঅর্ধি ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।

বান্দা যখন বলে,

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

حَمِدَنِيْ عَبْدِي.

আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে,

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي.

আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। যখন সে বলে,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.ِ

(যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَجَّدَنِي عَبْدِي.

আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করেছে।

যখন সে বলে,

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنِ.ُ

[(হে আল্লাহ) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।]

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.َ

এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।

যখন সে বলে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَاالضَّآلِّيْنَ.َ

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

এটা আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।
সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৫

এছাড়া নামাযের ছানা, রুকু-সিজদার তাসবীহ ইত্যাদিও পরোক্ষভাবে দুআ। কারণ মহান দাতার সামনে তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা তাঁর কৃপা লাভেরই প্রার্থনা। একারণে কোনো কোনো হাদীসে আল্লাহর যিকিরকেও 'দুআ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ দুআ এই ছিল

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير.

আর নামাযের আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদের পর বিশেষভাবে দুআ পাঠের নিয়ম রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'আত্তাহিয়্যাতু' শিক্ষা দান করেছেন। এরপর বলেছেন।

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو.

এরপর নামাযী তার কাছে সবচেয়ে পছন্দের দুআটি নির্বাচন করে দুআ করবে।
সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৩৫

সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত হয়। সালামের বাক্যটিও মূলত দুআ। নামায সমাপ্ত হওয়ার পর হাদীস শরীফে বিভিন্ন দুআর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখানে কিছু দুআ উল্লেখ করছি।

## সহীহ হাদীস থেকে নামাযের পরের কিছু দুআ

১. ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেনÑ

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

[ইয়া আল্লাহ! আপনিই ‘সালাম’ (শান্তিদাতা)। শান্তি আপনারই পক্ষ থেকে। হে প্রতাপ ও মর্যাদার মালিক! আপনি প্রভূত বরকতময়।]

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯১

নামাযের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত দুআ পড়ার বিষয়টি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। [সহিহ মুসলিম, হাদীস ৫৯২]

২. মুগীরা ইবনে শো‘বা রা.-এর কাতিব ওয়াররাদ বলেন, মুগীরা ইবনে শো‘বা রা. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-কে লিখেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক (ফরয) নামাযের সালাম ফেরানোর পর বলতেন,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁর। তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিমান। ইয়া আল্লাহ! আপনি যা দান করেছেন তা রোখার কেউ নেই। আর আপনি যা থেকে বঞ্চিত করেছেন তা দেওয়ার কেউ নেই। আর সম্পদশালীর সহায়-সম্পদ আপনার বিরুদ্ধে কোনোই কাজে আসবে না।)
-সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৪৪, ৬৩৩০, ৭২৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৩

৩. আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রা. প্রতি নামাযের শেষে যখন সালাম ফেরাতেন বলতেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون.َ

(আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিমান। শক্তি ও পরিবর্তন একমাত্র আল্লাহরই তাওফীকে।

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি। দান তাঁর। মর্যাদা তাঁরই, আর তাঁরই জন্য উত্তম প্রশংসা।
আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। উপাসনা-আনুগত্য একান্তই তাঁর জন্য। কাফিরদের তা অপছন্দের হলেও।)

তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযের শেষে এই বাক্যগুলো দ্বারা ‘তাহলীল’ করতেন।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৪

‘তাহলীল’ অর্থ ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ’ বলা। উপরের দুআয় এই বাক্যটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

৪. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পর তেত্রিশ বার ‘তাসবীহ’

করবে, তেত্রিশ বার 'হামদ' করবে এবং তেত্রিশ বার 'তাকবীর' বলবে, ফলে নিরানব্বই হল, এরপর এই দুআ দ্বারা একশত পূর্ণ করবে।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير.ٌ

তার পাপরাশি সাগরের ফেনা সমপরিমাণ হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৭

৫. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরলেন এবং বললেন, হে মুয়ায! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালবাসি। আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালবাসি। এরপর বললেন, তোমাকে অসিয়ত করছি।
হে মুয়ায! কোনো নামাযের পর এই দুআ পড়তে ছেড়ো না।

اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِك.َ

ইয়া আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন; যেন আপনার যিকির করি, আপনার শোকর করি এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করি।
-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫২২

এছাড়া আরো যিকির ও দুআ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নামাযের ভেতর-বাহির মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় পরিপূর্ণ।

## নামায আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায়

এই নামায মুমিনকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِب.

কখনো নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন এবং (সিজদা ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে) নিকটবর্তী হোন।
-সূরা আলাক : **১৯**

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তেন আবু জাহল নানাভাবে তাঁর নামাযে বাধা সৃষ্টি করত। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পরোয়া না করে নামায আদায়ে যত্নবান থাকার নির্দেশ দান করেছেন। তাঁর সকাশে সিজদা করতে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে বলেছেন। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নামাযে সিজদা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের বড় উপায়।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে।

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِد.

বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাবনত।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২

এখানে আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও কর্তৃত্বের ভেতরে। এদিক থেকে সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে নয়। মুমিন-কাফের সবার সকল কর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ অবগত। গোটা সৃষ্টিজগত তাঁর কবজার ভেতরে। তবে এটা হচ্ছে সাধারণ নিকটবর্তিতা। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্য শুধু সৎকর্মপরায়ন মুমিনদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْن.َ

নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত ঈমানদার সৎকর্মপরায়নদের অতি নিকটে।
-সূরা আরাফ : ৫৬

সেই নৈকট্যের অর্থ তাঁর সন্তুষ্টি, দান ও অনুগ্রহ। কাজেই সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি অর্জন করে, সবচেয়ে বেশি দান ও অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হয়।

উপরের পাঁচটি বিষয় নামাযের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, এই বিষয়গুলো রক্ষা করে নামায আদায় করা হলে নিঃসন্দেহে এই নামায বান্দার গোটা জীবন ও কর্মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করবে। তার চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস ঈমানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হবে, স্বভাব-চরিত্র নির্মল ও পবিত্র হবে, কাজ-কর্ম পরিশুদ্ধ ও গোনাহমুক্ত হবে। মহান আল্লাহ তাআলার দান ও অনুগ্রহে তার গোটা জীবন সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

## নামায ঈমান ও ইসলামী জীবনের যোগসূত্র

একজন মুমিনের জন্য যেভাবে ইসলামী জীবন তথা আনুগত্যের জীবন যাপন করা আবশ্যক, নামায সে জীবন সৃষ্টি করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। যেন নামাজ ঈমান ও ইসলামী জীবনের মধ্যের যোগসূত্র আর এজন্যই ঈমানের পর অন্যান্য সকল আমল থেকে নামাজের গুরুত্ব মর্যাদা সর্বাধিক । নামাজকে যদি আমরা বীজ ও শিকড়ের সাথে তুলনা করি আর বাকি দ্বীনের আমলী ব্যবস্থাকে গাছ ধরি, তাহলে নামাজ হলো ওই গাছের মূলকাণ্ড, যা বীজ থেকে সৃষ্টি হলেও তার উপরে অবশিষ্ট ছোট বড় সকল শাখা-প্রশাখা, লতা-পাতা ও ফুল-ফল এ কাণ্ড হতে বের হয় এবং এর উপরেই নির্ভরশীল থাকে।
যেমন আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সর্বপ্রথম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দায়িত্বটি

অর্পিত হয় সেটা হল নামাজ। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় ঈমান ও তাওহীদের পর প্রথম ফরজ আমল হিসেবে নামাযের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে ।
—আল বাকারা - ৩

কোন ব্যক্তি রসুলে করিম (সাঃ) কে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করে তাঁর দিন নিয়ে দাওয়াতকে কবুল করলেন ইসলাম তার থেকে সর্বপ্রথম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি দাবি করে সেটি হল নামাজ। তা ইসলাম ধর্মে নামাজের মর্যাদা এমন এক উচ্চ প্রজ্ঞাবৃত্তিক বিষয় ও দুর্বুদ্ধ রহস্য নয় যার সম্পর্কে কোন প্রকার চিন্তাভাবনা ছাড়াই ঈমান আনতে হবে বরং বাস্তবতা হলো স্বয়ং নামাজের হাকিকত ও বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করলে একসময় অবশ্যই বুঝে আসবে যে ইসলাম ধর্মের নামাজের মর্যাদার অবস্থান কেমন।

## নামাজ মানুষের ভেতর-বাহির সবকিছুর জিকির:

নামাজ কেবল মৌখিক স্মরণই নয়, বরং বাস্তবতা হলো, উদাসীনতা দূর করে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতিকে জাগ্রত করে স্মরণের যে সমস্ত পদ্ধতি অনুগতের প্রতি উৎসাহিত করে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও কার্যকর মাধ্যম হলো নামাজ। কারণ আমাদের মধ্যে অন্তর, মুখ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস ও শৃঙ্খলার সাথে আল্লাহর স্মরণ ও দাসত্বের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশ নেয় এবং নিজ নিজ পরিমন্ডলে নিজ নিজ অজিফা আদায় করে। অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব মহত্বের ধ্যান, মুখে সে অনুযায়ী তার তসবিহ ও তাহমিদ পবিত্রতা ও প্রশংসা মহিমা ও গুণকীর্তনে ব্যস্ত। আর মাথা থেকে পা জিকির ইবাদত দাসত্ব ও মুখাপেক্ষিতার প্রতিচ্ছবি। কখনো হাত বেঁধে দাঁড়ায়। কখনো মাথা নোয়ায় আর কখনো সেজদায় পড়ে আরাধনা ও প্রার্থনার চূড়ান্ত রূপ প্রদর্শন করে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে ( র.) তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে বলেন,
নামাজের মূল বিষয় তিনটি।

১) আল্লাহর অসীম ও অনিঃশেষ মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধ্যানে অন্তর বিভোর থাকা।
২) আল্লাহ তাআলার এই মহত্ত্ব ও বড়ত্ব এবং নিজের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার বাক্যমালা নিজ মুখে বলা।
৩) অন্যান্য বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ও আল্লাহর মহত্ব শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিজের অসহায়ত্ব ও দাসত্বের সাক্ষ্যদানের জন্য ব্যবহার করা।

## কেয়ামত দিবসে নামাজকেই পরিমাপক বানানো হবে।

কেয়ামত দিবসে নামাজকে পরিমাপক ও নিক্তি বানিয়ে জীবনের পরীক্ষা নেওয়া হবে আর এর ভিত্তিতে মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার ফয়সালা করা হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এরশাদ করেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

“কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামাজের হিসাব দিতে সক্ষম হবে, সে সফল হবে ।আর যে ব্যক্তি নামাজের হিসাব দিতে পারবে না,সে ধ্বংস হবে।
( তিরমিজি -৪১৩,ইবনে মাজা-১৪২৫, ১৪২৬)।

মোটকথা, কেয়ামতের দিন নামাজ গোটা মানুষের জীবনের নমুনা, পরিমাপক ও দর্পণ হবে।
আর এমনটা হওয়া উচিত। কারণ যখন একথা প্রতীয়মান হলো যে, একমাত্র নামাজই দ্বীনি জিন্দেগি পয়দা করে আর তার শিরা উপশিরায় জীবন সঞ্জীবনীততে পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং নামাজ প্রত্যেক মানুষের গোটা জীবনের নিরিখ ও নিক্তি হওয়া সম্পন্ন যুক্তিসঙ্গত। বিজ্ঞ চিকিৎসক শিরা দেখে হৃদয়শক্তির অনুমান করে মানুষের শারীরিক অবস্থা ভালো-

মন্দ যাচাই করে। এমনিভাবে কিয়ামতের দিবসে নামাজের মাপকাঠিতে জীবনের দিনে পরিমাপ করা হবে।

## কিছু নামাজের ফজিলত

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজেরই আল্লাহতালা বিশেষ কিছু ফজিলত দিয়েছেন। একেক নামাজ একেক দিক দিয়ে ফজিলত পূর্ণ যা আমাদের আত্মিক এবং বাহ্যিক অনেক উপকার সাধন করে।এর মধ্যে অন্যতম হলো ফজরের নামাজ।

এছাড়াও বিভিন্ন নফল নামাজের ফজিলত বিভিন্ন রকম গুরুত্ববহন করে। ফরজ নামাজের পাশাপাশি নফল নামাজগুলো আমাদেরকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার এক অপার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

আমরা এখানে ফজরের নামাজ, তাহাজ্জুদের নামাজ, হাজতের নামাজের ফজিলত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব।

## ফজরের নামাযের ফযীলত

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজেরই আল্লাহতালা বিশেষ কিছু ফজিলত দিয়েছেন এর মধ্যে অন্যতম হলো ফজরের সালাত।

মুমিন মাত্রই যত্নের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে থাকেন। তবে মানবজাতির চিরশত্রু ইবলিস সর্বদাই চেষ্টা করে, যেন মুমিনগণ নামায থেকে গাফেল হয়ে পড়ে। শয়তানের ধোঁকা ও গাফলতের কারণে অনেকেই নামাযে অবহেলা করেন বা নামায ছেড়ে দেন; যা মুমিনের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ। বিশেষ করে ফজর ও আসরের নামাযে বেশি গাফলতি হয়ে থাকে। মহান রাব্বুল আলামীন তাই কুরআনুল কারীমে এই দুই নামাযের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى.

তোমরা সকল নামায এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী (তথা আসরের) নামাযের প্রতি যত্নবান হও।
-সূরা বাকারা : ২৩৮

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

এবং স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন; সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।
-সূরা ত্ব-হা : ১৩০

এই আয়াতে গাফলতের দুই ওয়াক্ত ফজর ও আসরের নামাযের কথা উল্লেখ করে এর সবিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

যাইহোক, এ দুই গুরুত্বপূর্ণ নামাযের মধ্যে আজ আমরা আলোচনা করব ফজরের নামায বিষয়ে; যে নামাযের মাধ্যমে মুমিনের দিবসের সূচনা হয়। এই নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে; সেখান থেকে কিছু বিষয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

এক. আল্লাহ কসম করেছেন ফজরের

প্রতি ওয়াক্ত নামাযই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ফজরের গুরুত্ব অন্য সব ওয়াক্তের তুলনায় বেশি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফজরের কসম করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ.

কসম ফজর-কালের। এবং দশ রাতের।

-সূরা ফাজর : ১-২

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরই কসম করেন। যেহেতু আল্লাহ ফজরের কসম করেছেন, তাই এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই সময় এবং এই সময়ে আদায়কৃত নামাযের গুরুত্ব অন্য সময় ও নামাযের তুলনায় বেশি।

ফজরের নামায এবং ফজরের তিলাওয়াতের গুরুত্ব প্রকাশ করে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

(হে নবী!) সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাকুন। স্মরণ রাখুন, ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ।
-সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৮

শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনে এ আয়াতের টীকায় লেখেন-

“মুফাসসিরগণ এর [অর্থাৎ ‘ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ’- একথার] দুই রকম ব্যাখ্যা করেছেন :

ক. অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, ফজরের নামাযে যে তিলাওয়াত করা হয়, তাতে ফিরিশতাদের দল উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায়, মানুষের তত্ত্বাবধানের কাজে যেসকল ফিরিশতা নিয়োজিত আছে, তারা নিজেদের দায়িত্ব পালাক্রমে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। একদল আসে ফজরের সময়। তারা দিনের বেলা দায়িত্ব পালন করে। আরেক দল আসে আসরের সময়। তারা রাতের বেলা দায়িত্ব পালন করে। প্রথম দল ফজরের নামাযে এসে শরীক হয় এবং কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শোনে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

খ. একদল মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা মুসল্লীদের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাযে মানুষ যেহেতু ঘুম থেকে উঠে শরীক হয়, তাই তারা যাতে ঠিকভাবে নামায ধরতে পারে, সে লক্ষ্যে নামাযে তিলাওয়াত দীর্ঘ করা বাঞ্ছনীয়।"

সুতরাং ফজরের জামাতে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া কাম্য।

আসলে ফজরের জামাতে উপস্থিত হতে না পারা বহু কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার নামান্তর।

দুই. ফজরের জামাতে উপস্থিত হতে পারা ঈমানী শক্তির পরিচায়ক

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

এশা ও ফজরের নামায মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ নামাযের পুরস্কার বা সওয়াব কত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই নামাযে (জামাতে) হাযির হত। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫১

তিন. ফজরের নামায আদায় করুন, আল্লাহ তাআলার জিম্মায় দিনযাপন করুন

সাহাবী জুনদুব আলকাসরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ...

যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় চলে গেল।... -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫৭

ইমাম কুরতুবী রাহ. বলেন, فِي ذِمَّةِ اللهِ অর্থ হল-

في أمان الله وفي جواره.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে থাকা।
যে আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে থাকে, কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।
-আলমুফহিম লিল কুরতুবী ২/২৮২

চার. ফিরিশতাগণ আল্লাহর কাছে আপনার পক্ষে সাক্ষী হবেন

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّون.

ফিরিশতাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমণ করেন। এক দল দিনে, এক দল রাতে। আসর ও ফজরের নামাযে উভয় দল একত্র হন। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি যখন উঠে যান, তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় দেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই বান্দাদের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

উত্তরে ফিরিশতারা বলেন, আমরা তাদের নামাযরত দেখে এসেছি। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাযরত ছিল।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩২

সুতরাং যে ব্যক্তি নিয়মিত ফজর ও আসরের নামায জামাতে আদায় করছে ফিরিশতারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছে- আমরা যখন পৃথিবীতে

গিয়েছি তাকে নামাযরত দেখেছি, আবার যখন পৃথিবী থেকে প্রস্থান করেছি তখনও তাকে নামাযরত দেখেছি। বান্দার জন্য ফিরিশতাদের এ সাক্ষ্য কত মূল্যবান! এ দুই নামাযে যত্নবান হওয়ার ফলে ফিরিশতারা এমনভাবে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে, যেন সে সারাদিনই সালাত-ইবাদতে মগ্ন ছিল।

পাঁচ. জান্নাতের সুসংবাদ

সাহাবী আবু মূসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার সময়ের (অর্থাৎ ফজর ও এশার) নামায আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
-সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩৫

জান্নাত অর্জন একজন মুমিনের পরম চাওয়া। যত ইবাদত-বান্দেগী এবং মেহনত-মুজাহাদা সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভ। জান্নাত লাভের সুসংবাদ শুনতে মুমিন খুব পছন্দ করে। সুতরাং এশা ও ফজরের ব্যাপারে যত্নবান হোন এবং নবীজীর যবানে জান্নাতের সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হোন। আল্লাহ সকল মুমিনকে জান্নাতের জন্য কবুল করে নিন।

ছয়. সারা রাত ইবাদতের সওয়াব অর্জন করুন

উসমান ইবনে আফফান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত নামাযে দণ্ডায়মান থাকল। যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে আদায় করল সে যেন সারা রাত নামায আদায় করল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫৬

এই হাদীসটি একজন মুমিনের জন্য বিশাল সুসংবাদ। কারণ, সারা রাত ঘুমিয়ে থেকেও রাতভর নামায আদায়ের সওয়াব আমলনামায় লেখা হচ্ছে।

দুই নামায জামাতে আদায়ের মাধ্যমে সারা রাত ইবাদতের সওয়াবের অধিকারী হতে পারা অবশ্যই একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আল্লাহ বড় মেহেরবান!

কোনো বুদ্ধিমানই এ ফযীলত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না।

সাত. ফজরের নামায আদায়কারী লাভ করবে আল্লাহর দীদার

সাহাবী জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন-

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ - أَوْ لاَ تُضَاهُونَ - فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَالَ: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদ দেখতে পাচ্ছ। তোমরা আল্লাহকে দেখতে কোনো প্রকার ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। যদি এ নিআমত লাভ করতে চাও, তাহলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযের (অর্থাৎ ফজর ও আসরের) প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান হও (কোনো প্রকার গাফলতের শিকার হয়ো না এবং শয়তানের কাছে পরাস্ত হয়ো না)। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

[এবং স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন- সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

-সূরা ত্ব-হা : ১৩০]

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩৩; সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৫১

আলোচ্য হাদীসটিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার মতো বাক্য হল-

অর্থাৎ, তোমরা এ নামাযদ্বয়ের ব্যাপারে শয়তান বা গাফলতের কাছে পরাস্ত হয়ো না।

বোঝা যাচ্ছে, আসর ও ফজরের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে মানবীয় দুর্বলতা ও গাফলতের একটা বিষয় রয়েছে। এসময় মানুষ ঘুমে বা বিশ্রামে থাকে এবং গাফলতের শিকার থাকে। ফলে নফসের সাথে লড়াই করে নামাযের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এর সাথে যুক্ত হয় মানবজাতির চিরশত্রু শয়তানের ওয়াসওয়াসা! শয়তান বলতে থাকে, 'আজ না হয় থাক, কাল থেকে ইনশাআল্লাহ...', 'বাসায় নামায আদায় করলেও তো হয়, সওয়াব একটু কম হবে, কিন্তু নামায তো হয়ে যাবে' ইত্যাদি। এসব কারণে বনী আদম কাবু হয়ে যায়। পরাস্ত হয়ে যায় নফস ও শয়তানের কাছে। তাই এই দুই নামাযের ব্যাপারে নবীজী  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

যেহেতু নফস ও শয়তানের সাথে অনেক মুজাহাদা করে একজন মুমিনকে এই দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়, তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বড় পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন; আল্লাহর দীদার লাভের পুরস্কার! বান্দা আপন রবকে দেখতে পাবে- এর চেয়ে বড় পাওয়া ও বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে। এ পুরস্কার লাভের জন্য তো বান্দা যেকোনো কষ্ট স্বীকার করতেও রাজি।

আট. জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা

উমারা ইবনে রুআইবা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا- يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায আদায় করে সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩৪

মানুষের বড় বড় সফলতার একটি হল, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারা। জান্নাতের আশাও যেমন থাকবে, তেমনি জাহান্নাম থেকে বাঁচার আকুতিও থাকতে হবে; তবেই চূড়ান্ত সফলতা অর্জন হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

যাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাতে দাখিল করা হল সে-ই সফলকাম হল। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৫

নয়. দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝের সবকিছুর চেয়ে দামী কিছু পেতে চাই!

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

ফজরের দুই রাকাআত নামায (আমার কাছে) দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭২৫

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ দুনিয়া কামাই করার জন্য কত পরিশ্রমই না করে। অথচ এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। অতি শীঘ্রই তা শেষ হয়ে যাবে। অপরদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। একজন মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরকালের জীবন শুরু হবে; কিন্তু শেষ হবে না

কোনোদিন-অনিঃশেষ। এই জীবনের পাথেয় হল ইবাদত ও আমল। ফজরের দুই রাকাত নামায এই অনিঃশেষ জীবনের এক মূল্যবান পাথেয়।

দশ. কিয়ামতের দিন নূরপ্রাপ্তির সুসংবাদ

আখেরাত জীবনের কঠিন কঠিন ঘাটি পার হওয়ার জন্য প্রয়োজন নূর ও আলোর। রাতের শেষ অন্ধকারে আদায় করা এই নামায আমার জন্য শেষ দিবসের আলো হবে; যা আমাকে জান্নাত পর্যন্ত পথ চলতে সাহায্য করবে; যা না হলে আমি সেখানের অন্ধকারে হারিয়ে যাব। যদি নূরের অধিকারী হতে পারি, তাহলেই পৌঁছতে পারব পরম কাংক্ষিত জান্নাতে।

বুরায়দা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অন্ধকারে পায়ে হেঁটে (ফজরের নামায আদায় করতে) মসজিদে গমনকারী ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ দাও- কিয়ামতের দিন তাদেরকে পরিপূর্ণ নূর দান করা হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫৬১; জামে তিরমিযী, হাদীস ২২৩

তাহলে দেখা যাচ্ছে যত বড় বিষয়, তা অর্জনের জন্য আমাদের প্রস্তুতিও হয় তত আগ থেকে এবং সে পরিমাণ গুরুত্বের সাথে। ফজরের নামাযের এসকল পুরস্কার ও ফযীলত যদি লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এর জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। কেবল মৌখিক ইচ্ছা আর (প্রচেষ্টাহীন) দুআ যথেষ্ট নয়। আমার ইচ্ছা ও দুআ অনুযায়ী আমার সারাদিনের কাজ গুছিয়ে আনতে হবে। রাতে আগে আগে শুয়ে যেতে হবে। রাতে ঘুমাব দেরি করে আর আকাক্সক্ষা করব- সময়মত ঘুম ভাঙার- তা হবে না।

আসলে চেষ্টা তো থাকবে একটু আগে উঠে দুই-চার রাকাত তাহাজ্জুদ আদায়ের; তাহলে আশা করা যায়, আন্তত ফজর কখনো কাযা হবে না। তবে এজন্য রাতে আগে আগে ঘুমানোর কোনো বিকল্প নেই।

আমরা নবীজীর শেষ রাতের ইবাদতের কথা শুনি এবং নিজের জন্য তা কামনা করি; কিন্তু এটার প্রতি আমাদের মোটেও ভ্রুক্ষেপ নেই যে, নবীজী এশার পর দ্রুত ঘুমিয়ে যেতেন এবং আমাদেরকেও দ্রুত ঘুমিয়ে যেতে বলেছেন। ফলে এশার পর গল্প-গুজবে লিপ্ত হওয়া মাকরূহ। তাই আসুন রাতে আগে শুয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করি, তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং জামাতের সাথে ফজর আদায় করে লাভ করি দুনিয়া ও আখেরাতের নূর ও আলো।

## কিয়ামুল লাইল

রাত জেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায, মুমিনের মর্যাদার সিঁড়ি। জান্নাতের যাওয়ার অন্যতম উপায়। সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহর একান্ত ও প্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাহাজ্জুদ ছাড়েননি। ছুটে গেলে কাযা করতেন। নিজে আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করতেন।

জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে নবীজির খেদমতে আসতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মাঝে ওহীর জ্ঞান ও ঊর্ধ্বজগতের খবর পৌঁছানোর গুরুদায়িত্বটা ন্যস্ত ছিল তাঁর কাঁধে। নবীজীর কাছে আসতেন এবং কিছু উপদেশ ও নসীহত শুনিয়ে আবার সরে যেতেন মানবপরিবেশ থেকে। একদিন উপদেশ শোনানোর পর তিনি নবীজীকে একটি অসাধারণ দর্শন জানালেন-

يَا مُحَمّدُ! شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللّيْلِ وَعِزّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النّاس.ِ

قال المنذري في الترغيب والترهيب ৩৩৩ /১: إسناده حسن، وأشار إلى ثبوته الهيثمي في مجمع الزوائد২৫৩ /২ ،

হে মুহাম্মাদ! মুমিনের মর্যাদা কিয়ামুল লাইল- রাতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় ও বিভিন্ন বন্দেগীর মধ্যে, আর তাঁর সম্মান মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষিতার মধ্যে। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৯২১; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৪২৭৮

ফরয নামাযের পরেই যার স্থান।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুমিনের পরিচয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর পরই যে নামায আল্লাহর কাছে প্রিয় তা হল তাহাজ্জুদ। হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীস; নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرّمُ، وَأَفْضَلُ الصّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللّيْلِ.

রমযানের পর রোযা রাখার উত্তম সময় মুহাররম মাস আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায রাতের নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৫

যে আমল নবীজী কখনো ছাড়েননি

প্রিয় জিনিস কি কেউ কখনও ছাড়তে চায়? আর যদি সাথে যুক্ত হয় মজবুত ঈমান ও সওয়াবের আশা, হৃদয়ে থাকে প্রভুর প্রতি ভালবাসা এবং আমলের অদম্য প্রেরণা; তখন কঠিন কাজও হয়ে যায় অতি সহজ। হাঁ, আমাদের জন্য এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর জীবনসঙ্গীনী ও মুমিন-জননী হযরত আয়েশা রা.-এর যবান থেকেই এর একটি বিবরণ শুনুন। উরওয়া রাহ. বলেন, আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ يَقُومُ مِنَ اللّيْلِ، حَتّى تَتَفَطّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخّرَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أُحِبّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا.

(নবীজী) রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত বেশি নামায পড়তেন যে, তাঁর পাও মোবারক ফুলে যেতো। এ দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করছেন, অথচ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার কি উচিত নয় যে, (এই মহা অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে) আমি একজন পূর্ণ শোকর আদায়কারী বান্দা হব?'
-সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮২০

স্বেচ্ছায় তো ছাড়তেনই না, কখনো অনিচ্ছায় ছুটে গেলেও কাযা করে নিতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকেই বর্ণিত, রোগ-ব্যাধি কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারতেন, তবে দিনের বেলায় বারো রাকাত আদায় করে নিতেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৬

অন্য বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে কাইস রা.-কে হযরত আয়েশা রা. বললেন-

ياعَبْدَ اللهِ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللّيْلِ، فَإِنّ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلّى قَاعِدًا.

হে আবদুল্লাহ! কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে আদায় করতেন। -
সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯

তাহাজ্জুদ গোনাহ মিটিয়ে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللّيْلِ فَإِنّهُ دَأَبُ الصّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.

তোমরা কিয়ামুল লাইলের প্রতি যত্নবান

হও। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সালেহীনের অভ্যাস এবং রবের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। আর তা পাপরাশী মোচনকারী এবং গোনাহ থেকে বাধা প্রদানকারী। -জামে তিরমিযি, হাদীস ৩৫৪৯; মুসতাদরাকে হাকেম,  হাদীস ১১৫৬

কিয়ামুল লাইল জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য
পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ.

সেদিন নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। -সূরা যারিয়াত (৫১) : ১৫

সাথে তাদের কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণও এসেছে। তন্মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-

وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।
-সূরা যারিয়াত (৫১): ১৮

ইবাদুর রহমান-রহমানের বান্দাদের কতিপয় বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে কারীমের সূরা ফুরকানে। সেখানেও উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি বিবৃত হয়েছে-

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

আর তাঁরা রাত অতিবাহিত করে তাঁদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। -সূরা ফুরকান : ৬৪

সূরার শেষের দিকে তাদের পুরস্কারের বিবরণও এসেছে-

اُولٰٓىِٕكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا، خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا.

তাদের প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ। কারণ তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট! -সূরা ফুরকান : ৭৫-৭৬

কিয়ামুল লাইল জান্নাত লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির আমল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, মানুষের সাথে আমিও তাঁকে একনজর দেখবার জন্য বের হলাম। তাঁর চেহারা মোবারকের দিকে যখন তাকালাম, আমার বিশ্বাস হয়ে গেল, এ কোনো মিথ্যাবাদির চেহারা হতে পারে না। তখন তাঁর মুখে সর্বপ্রথম আমি যে কথাগুলো শুনেছি-

يَا أَيّهَا النّاسُ، أَفْشُوا السّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ، وَصَلّوا وَالنّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنّةَ بِسَلاَمٍ.

হে লোকসকল! সালামের প্রসার কর। মানুষকে আহার করাও! আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন তুমি নামায আদায় কর! তবেই নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। -জামে তিরমিযি, হাদীস ২৪৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩২৫১

অন্য হাদীসে পাওয়া যায়, উপরোক্ত গুণাবলী যাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, জান্নাতে থাকবে তাঁদের জন্য বিশেষ মর্যাদা। হযরত আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ فِي الْجَنّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّى وَالنّاسُ نِيَامٌ.

নিশ্চয়ই জান্নাতে রয়েছে এমন কিছু কক্ষ/প্রাসাদ, যার বাহির থেকে ভেতরাংশ দেখা যাবে, ভেতর থেকে বহিরাংশ দেখা যাবে। এগুলো আল্লাহ তাঁদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যারা মানুষকে খাবার খাওয়ায়, কোমল ভাষায় কথা বলে, ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখে, সালামের প্রসার ঘটায় এবং রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তারা নামাযে দণ্ডায়মান থাকে।

-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫০৯; জামে তিরমিযি, হাদীস ২৫২৭

# হাজত সালাত

আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল, সালাত বা নামায।

নামায এবং যাবতীয় ইবাদত মূলত সবরেরই একটি প্রকাশক্ষেত্র। তদুপরি এখানে নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; যা থেকে নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি আরো জোরালোভাবে সাব্যস্ত হয়। উপরন্তু নামায অবস্থায় বান্দা ইবাদতে মশগুল থাকার পাশাপাশি সকল গোনাহ ও পাপাচার থেকে এবং বিভিন্ন বৈধ কাজকর্ম থেকেও বিরত থাকে, যা সবরের অর্থকে আরো মজবুত করে।

সালাত মুমিনের সর্বপ্রধান ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর মাধ্যমে যেমন ইবাদত আদায় করা হয়, তেমনি তার প্রভাবে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হয়;
যেমনটি সূরা আনকাবূতের ৪৫ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

তাছাড়া নামাযের মধ্যেও বিভিন্নভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। যেমন সূরা ফাতেহায় তিলাওয়াত করা হয়—

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْن.ُ

(আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।)

এখানে ব্যাপকভাবে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা রয়েছে।

এমনিভাবে নামাযের বিভিন্ন দুআ-তাসবীহতেও রয়েছে বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের নানা প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা।

হাদীস শরীফে এসেছে, বান্দা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সবচে বেশি নিকটে থাকে। তাই সেই অবস্থায় বেশি বেশি দুআ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, সে সময়ের দুআ অবশ্যই কবুল হয়। এমনকি এ সময়ে

কৃত নবীজীর একটি দুআও বর্ণিত হয়েছে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّه.ُ

[হে আল্লাহ! আপনি আমার ছোট-বড়, প্রথম-শেষ, প্রকাশ-অপ্রকাশ্য সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিন।

: সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২, ৪৮৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১১২০

## সালাতের শারীরিক ও মানসিক উপকার

এবার আসি নামাজ পড়লে
শারীরিক ও মানসিক কেমন উপকার পাওয়া যায়,তা জেনে নেই।
আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন মুসলমানের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করেছেন। নামাজ দুনিয়ায় সব ধরনের অন্যায় কাজ থেকে আমাদের বিরত রাখে।

কর্মক্ষম উজ্জীবিত মানসিকতা লাভে নামাজ আল্লাহর এক মহা নেয়ামত। বান্দার জন্য অন্যতম রহমতও বটে।

তাইতো আল্লাহ তাআলা মানুষকে সার্বিকভাবে উজ্জীবিত করতে নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর নামাজ না পড়লে শাস্তির বিধানও রেখেছেন।

এছাড়া নামাজ আদায়ের মাধ্যমে অনেক শারীরিক এবং  মানসিক উপকার পাওয়া যায়। তাহলে চলুন কয়েকটি উপকারিতা সম্পর্কেগুলো জানি:

অজু: নামাজের জন্য মানুষকে প্রতিদিন পাঁচ বার অজু করতে হয়।

আর এতে মানুষের ত্বক পরিষ্কার থাকে। অজুর সময় মানুষের দেহের মূল্যবান অংশগুলো পরিষ্কার হয়। এতে জীবাণু থেকে ত্বক সুরক্ষা থাকে। এছাড়া চেহারার লাবণ্যতাও বাড়ে ও মুখের বলিরেখা কমে যায়।

নামাজে দাঁড়ানো: মানুষ যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন চোখ সিজদার স্থানে স্থির থাকে। ফলে মানুষের একাগ্রতা ও মনোযোগ বাড়ে।

রুকু: নামাজি ব্যক্তি যখন রুকু করেন আবার রুকু থেকে ওঠে সোজা হয়ে দাঁড়ান তখন মানুষের কোমর ও হাঁটুর ভারসাম্য রক্ষা হয়। রক্ত চলাচল বাড়ে। ফলে কোমর ও হাঁটু ব্যথা কমে।

সেজদা: নামাজে যখন সেজদা করা হয় তখন নামাজি ব্যক্তির মস্তিস্কে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হয়। ফলে তার স্মৃতি শক্তি বহুগুণে বাড়ে। আবার যে সেজদা থেকে ওঠে যখন দুই সেজদার মাঝখানে বসে এতে তার পায়ের উরু ও হাঁট সংকোচন এবং প্রসরণ ঘটে। এতে করে মানুষের হাঁটু ও কোমরের ব্যথা উপশম হয়।

সালাম ফেরানো: নামাজ শেষে বসা অবস্থায় ডান ও বাম দিকে সালাম ফেরানো হয়। এতে শরীরের শুধু মাথা ও ঘাড় ডান দিকে ও বাম দিকে ফেরানো হয়। এটা ঘাড়ের উত্তম ব্যায়াম, যা নামাজের মাধ্যমে সাধিত হয়।

বিনয়ী হওয়া: নামাজ মানুষকে সময় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। বান্দা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য সময় মতো নামাজে বিনয়ী হয়ে দাঁড়ায়। আর এখান থেকেই কীভাবে বিনয়ী হতে হয় তার শিক্ষাগ্রহণ করা যায়।

স্বাস্থ্য উপকারিতা: নামাজ মানুষের দেহের কাঠামোগত ভারসাম্যতা বজায় রাখে। ফলে স্থুলতা কমে। নামাজে নড়া-চড়া করায় অঙ্গগুলো স্থানভেদে সংবর্ধিত, সংকুচিত হয়ে বিশেষ কাজ করে থাকে। অঙ্গ ও জোড়াগুলোর বর্ধন ও উন্নতি এবং শক্তি বাড়ায়।

মন প্রশান্ত করে: নামাজের মাধ্যমে একজন মুসলমান নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণে আত্মিক দিক দিয়ে নামাজি ব্যক্তি শক্তিশালী হন। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যানে তার মন প্রশান্ত হয়। এবং অসাধারণ এক পরিবর্তন আসে।
কিশোর বয়সে নামাজ আদায় করলে মন পবিত্র থাকে ফলে নানা রকম অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উপকারিতা লাভের তাওফিক দান করুন।

## {{{নামাজ তরক করার বিধান}}}

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। ঈমান আনা, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা এবং রমজানে রোজা পালন করা। তারমধ্যে নামাজ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিত্তি। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম করণীয় আমল। এটি মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বাহ্যিক মাধ্যম। নামাজ পরিত্যাগকারী কাফের সমতুল্য।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, নামাজ ত্যাগের মতো ভয়াবহ গুনাহে লিপ্ত বর্তমান সমাজের অসংখ্য মুসলমান। প্রতিনিয়ত নামাজ ত্যাগের গুনাহ করতে করতে এমন স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেন এখন আর এটাকে সেভাবে গুনাহের কাজ মনে করা হয় না। আল্লাহর রাসুলের সা. দৃষ্টিতে নামাজ ত্যাগকারী দুনিয়াতে অভিশপ্ত আর আখিরাতে কঠিন শাস্তির যোগ্য। হাশরের মাঠে কঠিন পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব হবে।

ঈমান আনার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমলটি পবিত্র কুরআন অনেক বার ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা
সব মুসলিমের জন্য এ বিধান আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন।
মুসলমানমাত্রই নামাজ পড়তে হবে। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ইশারায়—যে অবস্থায় সম্ভব নামাজ ছাড়া যাবে না। একজন মুমিন ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, দেশে-বিদেশে, সাগরে-মহাকাশে যেখানেই অবস্থান করে, তাকে নামাজ পড়তেই হবে।

## নামাজে গাফলতি ও উদাসীনতার কারণ ও করনীয়:

মহান আল্লাহকে জানা,মানা,তাঁর আনুগত্য ও বন্দেগীর অঙ্গীকার করার পরও মানুষ থেকে নাফরমানি হয়ে যায় । আর এর মূল কারণ হলো গাফিলতি ও উদাসীনতা।
শয়তান মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও অন্তর দৃষ্টিতে গাফিলতি উদাসীনতার আবরণ ঢেলে আক্রমণ করে এবং তার দ্বারা নাফরমানি করিয়ে নেয়। কিন্তু খাঁটি মনে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্মরণ এর মাধ্যমে উদাসীনতার আবরণ কে ছিন্ন করা হলে -যারা আল্লাহকে চেনে এবং ভয় করে তারা বেঁচে যায়। অন্যায়ের কাজ থেকে বিরত থাকে। আর এই নামাজ গাফলতে দূর করার উত্তম ঔষধ ।কারণ নামাজ সরাসরি আল্লাহর 'স্মরণ'। শুধু তাই না, বরং আল্লাহর স্মরণেই নামাজের লক্ষ্য।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكۡرِى ۝

- আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।
—ত্বা-হা - ১৪

নামাযরূপে যখন আল্লাহর স্মরণ তার সম্মুখে অসহায়ত্ব ও প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ পরিপূর্ন নিপুভাবে হবে এবং মানুষের ভেতর বাহিরে তার প্রভাব পড়বে অর্থাৎ তার অন্তর, মুখ ও বাহ্যিক সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একইভাবে শরিক হবে আর এ আমল নিয়মিতভাবে দিন রাত কয়েকবার আদায় হবে। তখন উদাসীনতা কোনভাবে স্থায়ী হতে পারবে না। অন্যায়, অপরাধ, পাপ, অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ কাজও তার দ্বারা হবে না।

আল্লাহ পবিত্র কালামে বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰى عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ‌ؕ وَلَذِكۡرُ اللّٰهِ اَكۡبَر ؕ

" নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।"

সুরা আনকাবুত-৪৫

নামায মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার এক- অর্থ হতে পারে- নামাযের মধ্যে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি নামাযীকে মন্দ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে । দুই- নামাযের আকার-আকৃতি ও যিকির চায় যে, যেই নামাযী একমাত্র মহান আল্লাহর সম্মুখে স্বীয় দাসত্ব ও আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করা।

নামাজ যথাযথ গুরুত্ব ও যত্নের সাথে আদায় করা হলে তা ব্যক্তি জীবনকে পরিশুদ্ধ ও মার্জিত করে। আর কোন জাতি যখন সমষ্টিগতভাবে তা আদায় করে তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে সে জাতি বিশেষ রহমত, অনুগ্রহ লাভ করে। এমনকি সে জাতি খেলাফত তথা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ও লাভ করে।
পক্ষান্তরে অলসতা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হলে সে জাতি গোযব ও ধ্বংসের যোগ্য হয়। পবিত্র কুরআনের যেমন নামাজকে আল্লাহর বিশেষ রহমত বরকত উন্নতি অগ্রগতির কারণ বলা হয়েছে, তেমনিভাবে উদাসীনতা ও বেপরোয়াভাবে নামাজ পড়াকে ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۙ
الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۙ

সুতরাং বড় দুর্ভোগ আছে সেই নামাযীদের,
যারা তাদের নামাযে গাফিলতি করে।
—সূরা মাউন - ৪,৫

আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُلۡهِكُمۡ اَمۡوَالُكُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ۝

হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

(সুরা মুনাফিকুন : আয়াত ৯)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামাতের দিন বান্দার আমলগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে নামাজ। সুতরাং নামাজ ঠিক মতো আদায় করলে সাফল্য অর্জন ও মুক্তি লাভ সম্ভব হবে। অন্যথায় সে হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। এ জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিলো সে আল্লাহর জিম্মাদারি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

## নামাজ বিলম্বকারীর শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ۙ

তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার সাক্ষাত পাবে।

—মারইয়াম - ৫৯

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ নষ্ট বলতে বুঝিয়েছেন, নামাজ ছেড়ে দেয়া নয়, বরং নির্দিষ্ট সময়ের পরে নামাজ আদায় করা। এবং সুরা মাউনের আয়াতের ব্যাপারে হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, অর্থাৎ যারা তাদের নামাজের সময় বিলম্বিত করে। এ ধরনের লোকদিগকে কুরআনে নামাজি হিসেবে

উল্লেখ করা সত্ত্বেও নামাজ আদায়ে অলসতা প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে কঠিন"ওয়াইল" শাস্তির সতর্ক বাণী শোনানো হয়েছে।

কারো কারো মতে জাহান্নামের কূপকেও ওয়াইল বলা হয়। যে কূপে পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতগুলো নিক্ষেপিত হলে ওই কূপের উত্তাপে পাহাড়-পর্বতগুলো বিগলিত হয়ে যাবে। তবে যারা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে, আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাফ করতে পারেন।

নামাজে বিলম্বকারীদের শাস্তি যদি এতো ভয়াবহ হয়, তবে যারা নামাজ পড়েন না তাদের অবস্থা কেমন হবে? এ জন্য আল্লাহ তাআলা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের ব্যাপারে অগণিত অসংখ্য আয়াতে এবং হাদিসে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

## নামাজ ছেড়ে দেওয়ার ভয়াবহতা

আজকের সমাজে মুসলিম উম্মাহ কেন এতো দুর্দশাগ্রস্ত, শান্তি এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত তরক কারীরফরয এই ইবাদতটি নিয়ে বর্তমানে বহু মানুষের মধ্যে অবহেলা দেখা যায়। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার সময় অনেকের হয়, কিন্তু সালাত আদায়ের সময় তাদের হয় না। খোশগল্প করার সময় জোটে, কিন্তু মসজিদে গিয়ে আল্লাহর সাথে মুনাজাত করার সময় হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানোর সুযোগ হয় কিন্তু মুছাল্লায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে নিজের আবেদন-নিবেদন পেশ করার সময় হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততায় ছালাত ক্বাযা করা তো অনেকের কাছে স্বাভাবিক বিষয় মনে হয়। অথচ ছালাতে অবহেলা, অলসতা ও তা পরিত্যাগের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।
দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন। যে যেখানেই এবং যে অবস্থাতে থাকুক— নামাজ অবশ্যই আদায় করতে হয়। কেউ অসুস্থ হলে কিংবা যানবাহনে থাকলে, তার নামাজেরও সুরত ও পদ্ধতি রয়েছে।

আগের নবীদের যুগেও নামাজের বিধান ছিল। তবে পদ্ধতিগতভাবে পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাদের পরবর্তীতে লোকেরা নামাজের ব্যাপারে অবহেলা শুরু করে। অথচ ফরজ নামাজ আদায় না করা ভয়াবহ গোনাহের কাজ। আর এর কঠিন পরিণতি হলো- চিরদুঃখের ও কষ্টের জাহান্নাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত (নিক্ষেপ) করেছে? তারা বলবে- আমরা নামাজ পড়তাম না।’
(সুরা মুদাসসির : আয়াত ৪২-৪৩)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতো কঠিন ভাষায় বলেছেন,

“সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দেয়, সে কুফরি কাজ করে।
-তিরমিজি, হাদিস : ২৬২১

এই হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, যখন কেউ নামাজ ছেড়ে দেয়, তখন সে যেন কুফরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তার নামাজ না পড়াটা কুফরি কাজের সমতুল্য। নামাজ না পড়া কুফরিসদৃশ কাজ। তবে ওই ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা যাবে কি না, বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

## মুনাফিকদের কপটতাপূর্ণ নামাযের নিন্দা

নিফাক ও কপটতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কুরআনে মুনাফিকদের কপটতার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ তাআলা তাদের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

“নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, অথচ তিনিই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে”।

-সূরা নিসা : ১৪২

এখানে আল্লাহ মুনাফিকদের চারটি চরিত্র তুলে ধরেছেন-

ΔΔতারা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে।

বলাবাহুল্য, আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ। কিন্তু মুনাফিকরা কপটতা করে মনে করে তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিয়ে ফেলছে; আল্লাহ তাদের কপটতা সম্পর্কে অবগত নন!

ΔΔ তারা অলসতার সাথে নামায পড়ে। নামাযকে বোঝা মনে করে।

ΔΔ তারা মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে; আল্লাহর প্রতিদানের আশায় কিংবা তাঁর আযাবের ভয়ে নয়।

ΔΔ তারা নামাযে আল্লাহ্কে খুব সামান্যই স্মরণ করে। অথচ নামায হচ্ছে আগাগোড়া আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। যিকিরপূর্ণ সেই ইবাদতেই তারা আল্লাহকে অল্প স্মরণ করে। এ থেকে আন্দাজ করা যায় তারা কত অলস ও উদাসীন!

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْن.َ

তাদের দান কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কেবল এটা যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে এবং তারা নামাযে আসে (চরম) অলসতার সাথে এবং তারা ব্যয় করে (খুব) অনিচ্ছার সাথে। -সূরা তাওবা : ৫৪

এ আয়াতে মুনাফিকদের নিফাকের তিনটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে-

ΔΔ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে।

হাঁ, মুনাফিকরা আসলে কাফের। তাদের মধ্যে আর অন্য কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, অন্য কাফেররা অন্তরের মত মুখেও ইসলামকে অস্বীকার করে আর তারা অন্তরে অবিশ্বাস করে মুখে বিশ্বাসের কথা বলে।

ΔΔ তারা চরম অলসতার সাথে নামাযে আসে।

ΔΔ তারা আল্লাহর পথে খুব অনিচ্ছায় অর্থ ব্যয় করে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ، وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْن.

দুর্ভোগ সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা মানুষকে দেখায় এবং নিত্য ব্যবহার্য জিনিসও দেয় না।
-সূরা মাঊন : ৪-৭

এখানে আল্লাহ মুনাফিকদেরকে দুর্ভোগের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যারা নামায সম্পর্কে উদাসীন। নামাযের প্রতি, নামাযের ওয়াক্তের প্রতি যাদের গুরুত্ব নেই। যারা ইচ্ছা করে বিনা ওজরে নামাযের সময় নষ্ট করে। আর যাই পড়ে কেবল মানুষের ভয়ে পড়ে। যেখানে মানুষের ভয় নেই সেখানে নামায ছেড়ে দেয়।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোয় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কপটতাপূর্ণ নামাযের নিন্দা করে মুমিন বান্দাদের শিক্ষা দিচ্ছেন তারা যেন আগ্রহ, উদ্যম ও যত্নের সাথে নামায পড়ে এবং তাঁকে স্মরণ ও সন্তুষ্ট করার জন্য পড়ে। নামাযের ব্যাপারে অলসতা, উদাসীনতা ও লৌকিকতা না করে। নামাযে সঙ্গে এহেন আচরণের পরিণতি দুর্ভোগ।

## কাফেরদের কুফরী ও নামায না পড়ার উপর ভর্ৎসনা

আল্লাহ কুরআনে কাফেরদের অনেক ভর্ৎসনা করেছেন। এক জায়গায় তাদের নিন্দা করে বলেছেন-

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى، وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى، ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى، اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى، ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى.

সে বিশ্বাস করেনি এবং নামাযও পড়েনি। বরং সে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতঃপর সে দম্ভ করতে করতে তার পরিবারের কাছে চলে গেছে। দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। অতঃপর দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।

-সূরা কিয়ামাহ ৩১-৩৫

এ আয়াতে কাফেরের ভর্ৎসনা করা হয়েছে যে, সে ঈমানও আনেনি এবং নামাযও পড়েনি; বরং কুফরী করেছে এবং আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। উপরন্তু এগুলোর জন্য তার কোনো অনুতাপ নেই; বরং সে অহংকারের সঙ্গে চলে। আয়াতটির শেষে এই কাফেরদেরকে উপর্যুপরি দুর্ভোগের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

কাফেরের নিন্দার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে কুফরী করেছে; ঈমান আনেনি। আর ঈমান ছাড়া আমলের (তা যত বড়ই হোক) কোনো মূল্য নেই। আয়াতটিতে কাফেরের কুফরীর পাশাপাশি নামায না পড়ার নিন্দা করা নামায তরক করার ভয়াবহতা তুলে ধরে। এ থেকে বোঝা যায়, নামায না পড়া গুরুতর পাপ। সকলের উচিত দম্ভ-অহংকার ছেড়ে ঈমান আনা,

নামায পড়া। পক্ষান্তরে ঈমান ও নামায থেকে বিমুখ থাকা আল্লাহর কাছে অতি নিন্দনীয় এবং এর পরিণতি ভয়াবহ।

## নামায নষ্ট করার নিন্দা

আল্লাহ সূরা মারইয়ামে হযরত যাকারিয়া আ., ইয়াহইয়া আ., ঈসা আ., মূসা আ., হারূন আ., ইবরাহীম আ., ইসমাঈল আ., ইসহাক আ., ইদ্রিস আ.-এর আলোচনা করেছেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও নবী ছিলেন। তাঁদের আলোচনার শেষে আল্লাহ বলেছেন-

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

তাদের পরে অযোগ্য স্থলাভিষিক্তরা এল, যারা নামায নষ্ট করে ফেলল এবং খাহেশাতের পেছনে পড়ে গেল। সুতরাং তারা শীঘ্রই গোমরাহীর (পরিণামের) সম্মুখীন হবে।

-সূরা মারইয়াম - ৫৯

এ আয়াতে ওই নবীদের পরে আসা অযোগ্য জাতি-গোষ্ঠীর নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় মেতে উঠেছে এবং নামায নষ্ট করে ফেলেছে।

নামায নষ্ট করার একটি ভয়াবহ দিক হল নামায একেবারে না পড়া। এমনিভাবে সময়ের ভেতর না পড়াও নামায নষ্ট করারই অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াত থেকে অনুমান করা যায়, নামায নষ্ট করা কত গুরুতর গোনাহ। এর কারণে এত কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এটা আমাদেরকে এই বার্তা দেয়, নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে এবং সময়মত নামায পড়তে হবে। নামায নষ্ট করা যাবে না। নামায নষ্ট করা গোমরাহী।

আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, পার্থিব বিলাসিতা এবং নফসের খাহেশাতে মত্ত হওয়া বৈধ নয়। কারণ এর ফলে মানুষ আল্লাহ থেকে গাফেল ও বিমুখ হয়ে যায়।

## বেনামাজিরা জাহান্নামে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নবী ও হেদায়েতপ্রাপ্তদের পর এলো এমন এক অপদার্থ বংশধর, যারা নামাজ বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির পূজারি হলো। সুতরাং তারা ‘গাই’ নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো ধরনের জুলুম করা হবে না।’
(সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯-৬০)

কোরআনে কারিমের অন্য আয়াতে এসেছে, কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসা করা হবে— ‘কেন তোমরা সাকার নামক জাহান্নামে এলে? তারা বলবে, আমরা তো নামাজি ছিলাম না এবং আমরা মিসকিনদের খাবার দিতাম না; বরং আমরা সমালোচনাকারীদের সঙ্গে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। এমনকি আমরা প্রতিদান দিবসকে (কেয়ামত) অস্বীকার করতাম। আর এভাবেই হঠাৎ আমাদের মৃত্যু এসে গেল।’

(সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ৩৮-৪৭)

## নামাজ ছেড়ে দেওয়া কাফের হওয়ার মতো

আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘কোনো ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে ব্যবধান শুধু নামাজ না পড়া। যে নামাজ ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল (কাফেরের মতো কাজ করল)।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮২)

নামাজ পড়া মুসলিমদের একটি বাহ্যিক নিদর্শন। ঈমানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় হুকুম। আর নামাজ ছেড়ে দিলে— মুসলিমের থেকে ইসলামের বড় কিছু ছুটে যায়। তাই উমর (রা.) বলতেন, ‘নামাজ ত্যাগকারী নির্ঘাত কাফের।’
(বায়হাকি, হাদিস : ১৫৫৯, ৬২৯১)

এছাড়াও ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলি (রা.) বলেন, ‘যে নামাজ পড়ে না সে কাফের।’ (বায়হাকি, হাদিস : ৬২৯১)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন,
‘যে নামাজ পড়ে না সে মুসলমান নয়।’ (বায়হাকি, হাদিস : ৬২৯১)

তারা প্রত্যেকে নামাজ না পড়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উল্লেখ করেছেন। তারা বলতে চেয়েছেন যে, নামাজ পরিত্যাগ করা কাফেরদের কাজ। যে মুসলমান নামাজ পড়ল না— সে যেন কাফেরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করল।

## আল্লাহর জিম্মাদারি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ও সবকিছু হারানো।

ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ছেড়ে দিলে মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর থেকে তার জিম্মাদারি বা রক্ষণাবেক্ষণ তুলে নেন।
মুআজ (রা.) বলেন,
রাসুল (সা.) আমাকে দশটি নসিহত করেন, তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে তুমি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ

করল তার ওপর আল্লাহতায়ালার কোনো জিম্মাদারি থাকল না।' (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ৫/২৩৮)

নামাজ না পড়লে ইহকালেও বহু ক্ষতি সাধিত হয়। বুরাইদা (রা.) বলেন, নবী কারিম (সা.) ইরশাদ করেন,
'যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পরিত্যাগ করল— তার সব আমল বরবাদ হয়ে গেল।'
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫৩, ৫৯৪)
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তির আসরের নামাজ ছুটে গেল তার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের যেন বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।'
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫২

## জাহান্নামীদের নামায না পড়ার স্বীকারোক্তি

কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি পরকালে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হবে। এরকম একটি আলাপ সূরা মুদ্দাসসিরে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

فِىْ جَنّٰتٍ ۛيَتَسَآءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ.ۛ

তারা (ডানের লোকেরা) জান্নাতে থাকবে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা মিসকীনদের খাওয়াতাম না। আর (অসার) আলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমরাও তাতে লিপ্ত হতাম এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম। পরিশেষে নিশ্চিত বিষয় আমাদের কাছে এসে গেল। -সূরা মুদ্দাসসির (৭৪) : ৪০-৪৭

এখানে জান্নাতীদের জিজ্ঞাসার জবাবে জাহান্নামীরা নিজেরাই তাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলে দিয়েছে। তাদের এই স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট যে, নামায না পড়া, সম্পদের হক আদায় না করা, অসার কথাবার্তায় জড়িত হওয়া এবং বিচার দিবসকে অস্বীকার করার পরিণাম জাহান্নাম।

আল্লাহ কুরআনে জাহান্নামীদের এই স্বীকারোক্তি উল্লেখ করে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করছেন- তারা যেন জাহান্নামীদের পথে না চলে। বরং তারা ঈমান আনে। নামায পড়ে। সম্পদের হক আদায় করে। অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে।

শুধু পরকালীন শাস্তি নয়, নামাজ না পড়লে ইহকালীন জীবনও বরকতশূন্য হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির আসরের সালাত কাজা হয় তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল।
-মুসলিম, হাদিস : ১৩০৪

## কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনাকর শাস্তি

কিয়ামতের দিন বেনামাজি সর্বপ্রথম যে অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার শিকার হবে, কোরআনের একটি আয়াতে তার বিবরণ এসেছে, যার মর্ম নিম্নরূপ :'স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে। সেদিন তাদের আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল, তখন তো তাদের আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে। '
-সুরা : কালাম, আয়াত : ৪২-৪৩

যে নামাজ পড়ে না তার ঈমান খুবই দুর্বল। ইসলামে তার হিস্যা খুব সামান্যই। নামাজ না পড়াকে মহানবী (সা.) কুফরি কাজ ও কাফিরের স্বভাব বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এক হাদিসে এসেছে, যার ভেতর নামাজ নেই, তার ভেতর দ্বিনের কোনো হিস্যা নেই।
-মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস :৮৫৩৯

## পরকালে মুক্তির উপায় :

নামাজ পরকালে মুক্তির অন্যতম উপায়।
বুরাইদা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে (মুক্তির) যে প্রতিশ্রুতি আছে তা হলো নামাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দেয়, সে কুফরি কাজ করে।

-তিরমিজি, হাদিস : ২৬২১

নামাজ পড়া কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়! আর নামাজ না পড়া কত বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়! হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যত্নের সঙ্গে আদায় করবে, কিয়ামতের দিন এ নামাজ তার জন্য আলো হবে। তার ঈমান ও ইসলামের দলিল হবে এবং তার নাজাতের অসিলা হবে। আর যে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত নামাজ আদায় করবে না, কিয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নামাজ তার জন্য আলো হবে না। দলিলও হবে না এবং সে আজাব থেকে রেহাইও পাবে না।

-মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৫৭৬

নামাজে অবহেলা করার সময় উল্লেখিত বাণীগুলো সামনে রাখলে নামাজ পড়া আমাদের জন্য সহজ হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।
তিনি আরও বলেন,
مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمن لم يحافظ عَلَيْهَا لم يكن لَهُ نور وَلَا برهَان وَلَا نجاة وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

“যারা সঠিকভাবে নামাজের হিফাজত করবে, কিয়ামতের দিন এটা তাদের জন্য আলোকবর্তিকা, পথের দিশারী ও মুক্তির কারণ হবে। পক্ষান্তরে,

যে ব্যক্তি নামাজের হিফাজত করবে না, তার জন্য আলোকবর্তিকা হবে না, মুক্তির দিশারী হবে না, কিয়ামাতের দিন কারুন, হামান, ফিরাউন ও উবাই ইবনে খালফের সঙ্গে তাদের উত্থান হবে"।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮)

উলামায়ে কেরামগন বলেন,
∆ধন সম্পদের কারণে যারা নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলো তাদের হাশর হবে কারুনের সাথে। নেতৃত্ব ও রাজনীতির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে ফেরাউনের সাথে।

∆চাকরি বাকরির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে হামানের সাথে।

∆ব্যবসা বাণিজ্যর কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে উবাই ইবনে খালফের সাথে।

নামাজের সুফল এবং কুফলের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। আসুন নামাজের প্রতি যত্নবান হই।
জুমার নামাজের জন্য যেমন দুনিয়ার সব কাজ-কর্ম ফেলে আগ্রহের সঙ্গে আল্লাহর হুকুম পালনে মসজিদে আসা ফরজ। ঠিক প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজও যথা সময়ে আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রত্যেকটি মানুষের উপর তেমনি ফরজ।
আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুসলিমাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের তাওফিক দান করুন। দুনিয়া থেকে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত সব ধরনের ভয়াবহ শাস্তি থেকে হিফাজত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

## কেমন হওয়া চাই আমাদের নামাজ?

আচ্ছা, যদি কয়েক মিনিট বা ঘন্টার মধ্যে আমার মৃত্যু এসে হাজির হয়। তখন কি হবে আমার!

আমি তখন নিশ্চয়ই কামনা করব, আমার জীবনের শেষ নামাজটা যেন নিখুঁত হয়, সুন্দর হয়।

তাহলে আসুন, কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করি ,

তাইতোকবিতার আঁকারে বলি,,,

""""শেষবারের মতো সুযোগ পেয়েছি
জীবনের এটাই হয়তো আমার শেষ নামাজ,
কত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি।
সবকিছু ভুলে প্রভু শুধু আমি তোমার আজ!

উদাসীনতায় জীবনটাকে বিষাক্ত করে ফেলেছি,
রাজাধিরাজ তোমারি চৌকাঠে ঠেকাই এ তনু মন।
কবুল করো হে মহান, সুন্দরতম সাক্ষাতে,
কবুল করো আমায়, তুমিইত শ্রেষ্ঠ জন!"""""""

আশা করা যায়, এমন অনুভূতি ধারণ করে আমাদের মহান প্রতিপালকের দরবারে হাজির হলে আমাদের আমল সার্থক হবে।

কেউ হয়তো ভাবতে পারে, এ ধরনের চিন্তা লালন করা তো অশুভ ভাবনা, যা নেতিবাচক চিন্তার অন্তর্ভুক্ত! আমি বলব না, এ ধারণা মোটেও ঠিক না।

প্রকৃতপক্ষে এটি হলো নেক আমলের সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি। বরং নতুন করে জীবন আবিষ্কার করার এক অনন্য চিন্তা। মুসলিম জাতির সামরিক ইতিহাস পাঠ করে আমরা দেখি মৃত্যুর প্রতীক্ষা ও মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতির কারণেই মুসলিম

অভিযাত্রীগণ অনেক সামরিক অভিযানে জয়লাভ করেছেন, পৃথিবী তাদের  পদানত হয়েছে।

সুতরাং আমি যদি আস্থার সঙ্গে এই চিন্তায় বিশ্বাসী হই তাহলে আগামী দিনের নামাজ গুলো আমার সুন্দর হবে। আসুন আমরা নামাজ কিভাবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ হবে  তার কিছু বৈশিষ্ট্য  আলোচনা করি।

## প্রতিটি ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায়

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি জামাতের গুরুত্বের মধ্যে যে,
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

"জামাতে আদায়কৃত নামাজের মর্যাদা একাকী আদায়কৃত নামাজের চেয়ে ২৭ গুন বেশি।"
-সহীহ মুসলিম হাদিস নং -৬৫০।

সুতরাং এই উচ্চতর ফজিলত লাভ করতে চাইলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতের সাথে আদায় করা প্রবল আগ্রহ থাকতে হবে। বিষয়টি কেবল অধিক ফজিলত লাভেই সীমাবদ্ধ নয় মসজিদে জামাত পরিত্যাগকারী সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ আমার ইচ্ছে হয় জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই। এরপর আজান হলে এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়ে আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা জামাতে শরিক হয়নি)ঘর জ্বালিয়ে দেই।

দাবি হলো প্রতিটি মুসলিম পুরুষ জামাতে নামাজ আদায়ের প্রতি যত্নবান হবে এবং জামাত লাভের উদ্দেশ্যে আউয়াল ওয়াক্তে মসজিদে উপস্থিত হবে। শুধু তাই নয়; বরং প্রত্যেক নামাজ নিয়মিত প্রথম কাতারে আদায়ের সচেষ্ট হবে।

আর মহিলারা ঘরে নামাজ আদায় করবে।
( ঈদের নামাজ ছাড়া অন্য নামাজের জন্য) মহিলাদের মসজিদে জামাতে শামিল হওয়ার চাইতে স্বগৃহে,
বরং গৃহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অন্দরমহলে নামাজ পড়াই হলো উত্তম।
রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

"মহিলাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মসজিদ তার গৃহের ভেতরের কক্ষ" -মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাক হাকেম -১/২০৯, বায়হাকি, জামে-৩৩২৭।

## বিনম্র প্রকম্পিত চিত্তে,খুশু-খুযূ সহকারে নামাজ আদায়

নামাজে প্রকৃত খুশু-খুযূ অর্জনের অতি উত্তম ও চমৎকার একটি পদ্ধতি হল অন্তরে আল্লাহ প্রেমের বীজ রোপন করা। কেননা মানুষের স্বভাব হলো সে যাকে পছন্দ করে এবং ভালোবাসা, তার সাক্ষাতে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। অস্থির হৃদয় সে প্রিয়তম সাক্ষাৎ লাভের পথ ও সুযোগ খুঁজতে থাকে। এবং সাক্ষাৎ লাভের মুহূর্তটি সেই উপভোগ করে। সাক্ষাৎ শেষে আবার ভাবতে থাকে আবার কবে আসবে পরবর্তী সাক্ষাতের সময়! এমন মন প্রাণ দিয়ে উজাড় করে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিনীত সমাহিত হয়ে নামাজ আদায় করব।
নামাজ ধীরে ধীরে আদায় করব, নামাজে প্রত্যেকটা রোকন সুন্দর করে আদায় করব। নামাজকে উপভোগ করব ,নামাজের প্রশান্তি খোঁজে নেব।
তাইতো নবী (সা.) বলেছেন,

وجعلت قره عيني في الصلاة

"আর নামাজে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে”
- সুনানে নাসায়ী,হাদিস নং ৩৯৪০
মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং ১৪০৩৭

## নামাজে দীর্ঘ দোয়া

নামাজ হলো দোয়া কবুলের অন্যতম ক্ষেত্র। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কারণে নামাজের বিভিন্ন অংশে প্রচুর দোয়া করতেন। নামাজের সূচনাতে তাকবীরে তাহরিমার পর দোয়ার মাধ্যমে নামাজ শুরু করতেন।
আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম নামাজে তাকবীরে তাহরিমার পর কিরাতের পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন । আমি নবীজিকে বললাম ‘ইয়া রাসুল আল্লাহ’! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক! আপনি তাকবীর ও কিরাতের মাঝে কি বলেন?
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি বলি–
“হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যে রোগ দূরত্ব আপনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন পূর্ব পশ্চিম এর মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিষ্কার করে দিন, যে রূপ পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হতে। হে আল্লাহ!আপনি আমার গুনাহ সমূহ ধুয়ে ফেলুন বরফ ,পানি ও শিলা দ্বারা”।

-সহিহ বুখারি হাদিস নং ৭৪৪, সহীহ মুসলিম হাদিস নং ৫৯৮।

এবং আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন,

“”হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাই অলস,তা অতিবার্ধক্য, গুনাহ ও ঋণের বোঝা থেকে, কবরের সংকট ও আজাব থেকে, জাহান্নামের সংকট ও আজাব থেকে এবং প্রাচুর্যের অনিষ্ঠতা থেকে। আমি আপনার নিকট পানাহ চাই দরিদ্রতা থেকে, আপনার আশ্রয় চাই মাসিহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমুদয় গুনাহ বরফ ও

শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আমার অন্তর যাবতীয় পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করুন, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। আমার ও আমার গুনাহের সমূহের মধ্যে একটা দূরত্ব আপনি সৃষ্টি করে দিন, যতটা দূরত্ব আপনি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে করেছেন।’’’

সহীহ বুখারি হাদিস নং ৬৩৬৮

এ ছিল আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়া। যার কোন গুনাহ নেই তাঁর দোয়া যদি এমন হয় তাহলে আমাদের কি পরিমান দোয়া করতে হবে, তা সহজে অনুমেয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম রুকু- সেজদায় অধিক পরিমাণে তসবিহ পাঠ করতেন।
তিনি সেজদায় বেশি বেশি দোয়া করতে বলেছেন। কেননা, সিজদা হল বান্দার আপন রবের সবচেয়ে নিবিড় সান্নিধ্য লাভের মুহূর্ত। সিদজা অবস্থায় দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।
হযরত আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, সেজদা অবস্থাই বান্দা তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে অতএব তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণে দোয়া করবে।

-সহীহ মুসলিম হাদিস নং ৪৮২

পুরো নামাজই হলো দোয়া। নামাজের শেষাংশে তাশাহহুদের পরও দোয়ার বিধান রয়েছে। নবীর সুন্নত হল আমরা নামাজের গুরুত্বপূর্ণ রোকনে বেশি বেশি দোয়া করব। সেজদা ও তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে । সিজদা যেমন একটি রাকাতের সর্বশেষ আমল এবং নবীজির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাব্যতম ক্ষেত্র, তেমনি তাশাহহুদও হচ্ছে পুরো নামাজের সর্বশেষ আমল।

পুরো নামাজের প্রতিটি রোকনে আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহতালার মর্যাদা গুলো গুনকীর্তন করেছি এখন সময় এসেছে আল্লাহর কাছে চাওয়া ও প্রার্থনা করার ।এ কারণে

তাশাহুদের পর এবং সালামের পূর্বে পাঠ উপযুক্ত অনেক দোয়া সংরক্ষিত আছে হাদিসের নববীর সমৃদ্ধ ভান্ডারে।
এ প্রসঙ্গে আমরা দোয়ায়ে কুনুতের কথা চিন্তা করতে পারি। রাতের দীর্ঘ একটি অংশ নামাজে কাটানোর পর, প্রতিটি রাকাতের প্রত্যেকটি রোকণনে আল্লাহর তাকবীর ও মাহাত্ম্য, হামদ ও প্রশংসা ,তামজীদ ও মর্যাদা বর্ণনা করার পর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় দোয়া ও প্রার্থনা, অনুনয় ও মিনতির।
অর্থাৎ পুরো রাতের নামাজের পর বা আরোও ব্যাপক দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে একটি দিনের সকল ইবাদতের পর আমরা আমাদের সারাদিনের দীর্ঘ ইবাদতধারার সমাপ্তি ঘটাচ্ছি এক সুসমৃদ্ধ দোয়ার মাধ্যমে। সে দোয়ায় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি হেদায়েত ও পথনির্দেশ , আফিয়াত ও নিরাপত্তা এবং বরকত ও কল্যাণ ধারা। আর এসব কিছুর প্রার্থনা করছি সারা দিনের সকল নামাজে মহান আল্লাহতালা প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করার পর।

মোট কথা, দুনিয়ার সমস্ত পেরেশানি থেকে ফারেগ হয়ে, একমাত্র মহান প্রভুর দরবারে নিজের মন প্রাণ উজাড় করে সম্পূর্ণ ধ্যান-খেয়ালের সহিত খুব ধীরে সুস্থে, নামাজের প্রতিটি কথার অর্থ বুঝে বুঝে দীর্ঘ তিলওয়াত এবং রুকু সেজদা খুব যত্নের সাথে আদায় করব। এবং নামাজের মাধ্যমে আমার জীবনের যত চাওয়া সব আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করবো।
দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব আল্লাহ আমাদেরকে আদর্শ মুমিনের জীবন, সমুন্নত ইসলাম এবং মুসলিম জাতিকে করুন সম্মানিত মর্যাদাবান এক দেহ এক প্রাণ।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন,

"الكيس من دان نفسه،وعمل لما بعد الموت"
“”বুদ্ধিমান হলো ওই ব্যক্তির, যে স্বীয় নফসকে নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং মৃত্যুর পরের ( অনন্ত জীবনের) জন্য আমল করে।””

মুসনাদ আহমেদ হাদিস নং ১৭১২৩
সুনানে তিরমিজি হাদিস নং ২৪৫৯
সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং ৪২৬০

# শেষ কথা

নামায হলো পরশপাথরের মতো একটি ইবাদত। সম্পূর্ণ ধ্যান ও খুশুখুজুর সঙ্গে যে ব্যক্তি নামায আদায় করবে, নামাযই তাকে আমলে-আখলাকে ফেরেশতাতূল্য বানিয়ে তুলবে।

নামাযের নিয়ত, তাকবীর, কেরাত, রুকু, সেজদাসহ নামাযের সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতগুলো মাসায়িল মোতাবেক আদায় করলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি নামাযের মধ্যে কখন কোন রোকন আদায় করা হচ্ছে এবং কী কী পড়া হচ্ছে সেগুলোর দিকে খেয়াল রাখলে খুশু-খুযূ আদায় হবে। সেই সাথে কারো যদি সারা জীবনও নামায পড়তে কষ্ট হতে থাকে আর সে নফসের সাথে জিহাদ করে নামায পড়তে থাকে তাহলে সে এই কষ্টের জন্য অতিরিক্ত বিনিময় ও পুরষ্কার লাভ করবে।

উম্মতের নামাযের বিষয়ে নবীজির এত ফিকির ছিলো যে, দুনিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্তেও উম্মতকে নামায কায়েমের অসিয়ত করে গেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যও ওসিয়ত করেন। তাদের তিনি বলেন,

“ الصَّلاَةَ  الصلاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ”

“ নামায، নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসী।’” ।

( অর্থাৎ নামাজের প্রতি যত্নবান হও, নামাজের প্রতি যত্নবান হও, গোলাম,বাদীদের সাথে ভালো ব্যবহার কর।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা কয়েকবার উচ্চারণ করলেন।

[সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ-৬৩৭]

সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে নামাজ আমাদের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ফজিলত পূর্ণ ইবাদত!

যে সকল লোক  নামায পড়ে না, নামায কায়েমের চেষ্টা করে না,  কেয়ামতের দিন কীভাবে নবীজির সামনে দাঁড়াবো, কিভাবে নবীজীকে মুখ দেখাব! আমরা তো নবীজীর শেষ অসিয়তকেও আমলে নিচ্ছি না।অথচ নামাজ তরফ কারীর বিধান সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট জেনে আসছি।

জাবির (রা.) বলেন, আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি,
قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ " .

বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেওয়া।
(মুসলিম,  হাদিস : ১৪৮)

পরিশেষে বলবো আল্লাহতালা আমাদেরকে এরকম গর্হিত কাছ থেকে হেফাজত করে আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ তথা শরীআয়াত মোতাবেক চলার তৌফিক দান করুন।

আসুন আমরা সবাই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাষায় দুআ করি,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“হে আমার আল্লাহ! আমাকে এবং আমার বংশধরদেরকে নামাযী বানিয়ে দাও। হে আমাদের মালিক! আমাদের এ দুআ তুমি কবুল করে নাও। ওহে আমাদের প্রভু! আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং সকল ঈমানদারকে কেয়ামতের দিন তুমি ক্ষমা করে দিও”।

সূরা ইব্রাহীম -আয়াত ৪০-৪১